ত্রিপুর দেশের কথা

সম্পাদক

ত্রিপুর চন্দ্র সেন

ত্রিপুর দেশের কথা

(১৬২৬—১৭১৫ খ্রীঃ)

TRIPUR DESER KATHA

আসামের রাজা রুদ্র সিংহ ত্রিপুরা দেশে রত্ন কন্দলী ও অর্জ্জুন দাস নামক দুইজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'ত্রিপুর দেশের কথা'র পাণ্ডুলিপি তাহাদের দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দে রচিত। লণ্ডন সহরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত 'ত্রিপুর দেশের কথা' নামক হস্তলিখিত পুথি হইতে এই পুস্তকের পাঠ সংগৃহীত হইল।

TRIPUR DESER KATHA, written in 1724 A.D. by Ratna Kandali and Arjun Das, Ahom king Swargadeo Rudra Singha's envoys to Raja Ratna Manikya Deb of Tripura.

From an old manuscript named 'Tripur Deser Katha' in the British Museum, London.

EDITED BY

Tripur Chandra Sen B. Com, B. L., Advocate, Convener, Tripura Regional Records Survey Committee, Agartala, Tripura.

প্রকাশক ঃ—
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

প্রথম সংস্করণ
১৩৭২ বাং
পুনঃ মুদ্রণ- ১৯৯৭ ইং

মুদ্রণ ঃ—প্রিন্ট বেষ্ট, আগরতলা

মূল্য - ৫৫ টাকা

সূচিপত্র

	১	শুভেচ্ছা
	২	Introduction
	১৩	মুখবন্ধ
প্রথম অধ্যায়	১৯	স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের রণোদ্যম
দ্বিতীয় অধ্যায়	২১	প্রীতি সংস্থাপক আনন্দিরাম মেধি
তৃতীয় অধ্যায়	২৩	ত্রিপুরা রাজার সম্মুখে আসামের দূত
চতুর্থ অধ্যায়	২৫	আসামে ত্রিপুরার দূত
পঞ্চম অধ্যায়	২৭	স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের সভায় ত্রিপুরার দূত
ষষ্ঠ অধ্যায়	৩২	ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় গ্রহণ
সপ্তম অধ্যায়	৩৪	ত্রিপুরার দূতগণের দুর্গোৎসব দর্শন
অষ্টম অধ্যায়	৩৬	ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে যেখানে যাহা আছে তাহার বিবরণ
নবম অধ্যায়	৩৯	ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় পৌছিলাম
দশম অধ্যায়	৪১	ত্রিপুরা রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ
একাদশ অধ্যায়	৪৮	ত্রিপুরা রাজার পূর্ব্বপুরুষদের কথা
দ্বাদশ অধ্যায়	৫১	যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হত্যা
ত্রয়োদশ অধ্যায়	৫৪	রাজার দৈনিক কাজ
চতুর্দ্দশ অধ্যায়	৫৬	নিজে রাজা হওয়ার জন্য ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের প্রচার ও ষড়যন্ত্র
পঞ্চদশ অধ্যায়	৬০	ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাত্রা
ষোড়শ অধ্যায়	৬১	ত্রিপুরার দরবারে আসামের দূত
সপ্তদশ অধ্যায়	৬৭	দূতগণ কর্ত্তৃক আসামের যুদ্ধের বর্ণনা
অষ্টাদশ অধ্যায়	৬৯	ত্রিপুরায় মদন পূজা ও মোট খেলা

ঊনবিংশ অধ্যায়	৭২	রাজার বিরুদ্ধে ঘনশ্যামের সৈন্য সংগ্রহ
বিংশ অধ্যায়	৭৫	ঘনশ্যাম, মুরাদ্ বেগ্ এবং মামুদ ছফির মন্ত্রণা
একবিংশ অধ্যায়	৭৭	রাজধানীর নিকটে সসৈন্যে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর
দ্বাবিংশ অধ্যায়	৭৯	যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবের সৎ পরামর্শ
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	৮১	যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামের নিকট গেল
চতুর্বিংশ অধ্যায়	৮২	ঘনশ্যামের হাতে কোতোয়াল মুছিব বন্দী
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	৮৩	যুবরাজ গোপনে রাজাকে সমস্ত বিষয় জানাইল
ষড়বিংশ অধ্যায়	৮৫	ঘনশ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই বলিয়া রওনা হইল
সপ্তবিংশ অধ্যায়	৮৭	ত্রিপুরার সিংহাসনে ঘনশ্যাম বা মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা
অষ্টাবিংশ অধ্যায়	৮৯	রাজার ঘরে আগুন লাগিল
ঊনত্রিংশ অধ্যায়	৯১	গঙ্গানারাণী ধাই রত্নমাণিক্যকে বধ করিবার জন্য ঘনশ্যামকে পরামর্শ দিল
ত্রিংশ অধ্যায়	৯২	রত্নমাণিক্য রাজা বধ
একত্রিংশ অধ্যায়	৯৫	রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ সৎকার
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়	৯৭	মামুদ ছফির বিদায়
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়	৯৮	রংপুরে রাজসভায় মহেন্দ্র মাণিক্যের দূত
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়	১০১	মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট দূতযোগে পত্র ও উপঢৌকন প্রেরণ
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়	১০৩	ধর্ম্ম মাণিক্য আমাদিগকে বিদায় দিলেন
	১০৫	'ত্রিপুরা দেশের কথা' পুথির নির্ঘন্ট

শুভেচ্ছা

41/35B, Charue Avenue
Calcutta - 33
Date—20.7.60

Dr. Shashi Bhusan Das Gupta, M.A., Ph. D, Ramtanu Lahiri Professor of Bengali Language and Literature & Head of the Department of Modern Indian Languages, University of Calcutta.

শ্রীযুত ত্রিপুর চন্দ্র সেন মহাশয় সঙ্কলিত "গোজেন লামা" বইখানি পড়িয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা আমাকে আনন্দ দিয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি ত্রিপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসিগণের সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা, প্রচীন তথ্যাদি বিষয়ে একখানি গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক। তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প ও শ্রমনিষ্ঠা সকলের নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি। ইতি

স্বাঃ শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত

INTRODUCTION

This book deals with the Benga'i version of the manuscript named 'Tripura Deser Katha.' The manuscript was written by Arjun Das and Ratna Kandali in Assamese in 1724, who were sent three times by the Ahom Raja Rudra Singha to the courts of Raja Ratna Manikya Deb and Raja Mohendra Manikya Deb of Tripura begining from the year 1709 to 1715 A. D.

The location of the Mss. is traced through B. M. Add. 12,235-B, desribed on P.1 of J. F. Blumhardt's catalogue of Bengali, Assamese and Oriya Manuscripts in the Library of the British Museum, 1905. For further details of the Mss. it will not be out of place to print here the copy of the letter I received from Mr. W. Zwalf, Assistant Keeper of the British Museum London, dated the 23rd January, 1964

Department of Oriental Printed
Books & Mss.,
The British Museum
London, W.C.I
23rd January, 1964

Dear Sir,

Thank you for the parcel that you recently sent to the Museum. I should like to add to the official acknowledgment my personal expression of gratitude for your kind presentation.

The following are the answers to your questions about the manuscript recently reproduced for you. There are 147 leaves of bark (leaf 108 is missing); they measure 4 inches by $16^3/_4$; each side contains 5 lines, $12^3/_4$ inches long. The manuscript was apparently written in the 18th century. There are no paintings, engravings or other form of illustration either in the body of the manuscript or on the cover. According to the records of the Museum, the manuscript was purchased on 8th January, 1842 from a Mr. Rodd. There is no further information about the

manuscript or as to the identity of Mr. Rodd., except that he may have been a dealer and not the owner of the item.

I hope that this is satisfactory as far as it goes.

Yours faithfully
Sd/W. ZWALF
(W. Zwalf)
Assistant Keeper

Tripur Chandra Sen,
B. Con, B. L., Advocate,
16/1, Sakuntala Road,
P. O. Agartala, Tripura, India.

The Mss. had been recorded in Microfilm which has kindly been sent to me by the Museum. I examined and read the Mss. thoroughly. There is nothing indistinct in the Mss. and it can be read easily from the begining to the end. I have tried to the best of my capacity to translate the contents of the Mss. in Bengali keeping the spirit of the Mss. as far as possible. Raja Ratna Manikya Deb of Tripura and Raja Rudra Singha of Assam thought it proper to establish political relations mutually for the preservation of their own independence against the Moghuls; and as a token of this spirit the initiative of sending emissarieds grew up.

Anandiram Mehdi, a Bengali musician, who was intimately connected with Raja Ratna Manikya of Tripura happened to visit Ahom court at Rangpur[1], in connection with his own trade of music. Raja Rudra Singha asked him to establish a relationship between the two governments. Anandiram agreed to this proposal. Ratna Kandali and Arjun Das, though accompanied Anandiram to his home on the pretext of bringing the Ganges water for Barbarua Surath Singha, a very influential member of the Ahom court, were actually sent for fulfilling the aforesaid purpose.

Raja Ratna Manikya sent for Ratna Kandali and Arjun Das when he was informed by Anandiram Mehdi about the arrival of these two eminent persons, and on their appearance before him, he requested them to

accompany the Tripura emissaries viz Rameswar Bhattacharyee Nayalankar and Udai Narayan Biswas to Ahom court. The Tripura Deputation consisting of ten followers including a physician left Udaipur in June-July, 1710 A. D. in the company of the Assamese emissaries. On the way, the Tripura envoys halted at Khaspur, the capital of Kachar and presented their credentials to the Kachar Raj Durbar[2]. They arrived at Gazpur about an year after their starting from Udaipur and presented the letter and presents of Ratna Manikys to Barbarua Surath Singha who assured the Tripura emissaries of rendering all aid to make the mission a success.

Raja Rudra Singha received the Tripura envoys on C. August 12, 1711 A. D. at his the then capital Rangpur amidst grandeur and ceremony befitting to the occasion. On C. November, 18, 1711, the Ahom envoys started again for the capital of Tripura with the letters and presents from the Ahom Raja Rudra Singha and Barbarua Surath Singha to Raja Ratna Manikya along with the Tripura party. Thirty four paiks were engaged by the Ahom Government to accompany their agents. The combined party, after crossing Kachar Raj territory reached the mouth of the Rupini river which was the common boundary of Kachar and Tripura Raj territory and after that they had to cross over the mountain tracts of Tripura viz Rangrung, Taijalpara, Kumjung, Sairangchuk, the Deogang river, the Manu river, Kerpa, Chota Maricharai, Bara Maricharai and Khakrai. From Khakrai, the envoys went on horse back to Udaipur and reached there by the end of March, 1712. Rangrung was the extreme north-east border of the manipuris and the Kacharis with their commercial commodities.

On C. April 25, 1712 Ratna Manikya received the Assamese envoys in open Durbar. Before attending the Durbar, the Assamese envoys engaged two spies to note and measure the strength of Tripura Raja in disguise This book unfolds the part of the informations supplied by those spies the Assamese emissaries. This is the second visit of the Assamese envoys to Tripura Durbar.

Three days after the open Durbar at Udaipur, the Assamese emissaries were allowed private audience by Raja Ratna Manikya at night when they delivered a confidential letter of Raja Rudra Singha to him.

While the Assamese envoys were waiting for the ceremonial Durbar of Ratna Manikya to begin, Ghanashyam Deb Barthakur, the step brother of Ratna Manikya, conspired with Murad Beg, an influential Mughal, who was an employee under Ratna Manikya, to capture the throne of Tripura Murad Beg was sent to Dacca who recruited Baksarias (Hindoostani itinerant soldiers) for Ghanashyam and secured the help of Mahmud Sapi who was an employee under Mir Murad, a high Mughal officer at Dacca. Ghanashyam waited for a long time out of the town of Udaipur on the pretext of capturing wild elephants. Owing to unreserved faith of Ratna Manikya in his brother Ghanashyam, he did not believe any of the reports about the conspiracy which reached him. Ghanashyam succeeded in his plan and became the Raja of Tripura and assumed the title of Mahendra Manikya on C. May 19,1712. This change took place while the Assamese envoys were staying at Udaipur.

On C. Aug. 2,1712, Mahendra Manikya received the Assamese envoys formally. Ari Bhim Naran was sent as an envoy of Tripura Raja in January 1713, to Ahom court with letters and presents to Barbarua Surath Singha and Raja Rudra Singha. The Tripura envoy was formally received there on C. Jan. 15,1714, at Rangpur. This is the second mission of Tripura Government to Ahom court.

On April, 1714, the same assamese envoys started for Tripura on their third mission and were accompanied by Ari Bhim Naran, the Tripura envoy. This party reached Udaipur in January, 1715. In the meantime, Mahendra Manikya died of the disease of grahani after ruling for one year and two months and Durjoy Singha, who was Jubraj during the reign of Ratna Manikys and Mahendra Manikya, succeeded to the throne assuming the name of Dharma Manikya.

The Assamese emissaries were received in Tripura Durbar in May, 1715. This is the 3rd Assamese Mission to Tripura Durbar. The party was allowed to return back to Rangpur with presents and letters to Raja Rudra Singha and Barbarua Surath Singha. Dharma Manikya assured his general friendship to the Ruler of Assam but he did not sent any emissary at this time to Ahom court. This is apparent that the Mss. was written by the two Assamese emissaries with a view to submitting their report to the Ahom court as to the true political and financial position of

their neighbouring country of Tripura; which informations could be used if any occasion would arise for the joint action of the Governments of Assam and Tripura against the Mughals.

The authors narrated the index of the chronicle in four folios by the end of the Mss. The topographical account and the side lights on the social and political organisation of the country are rarely found in any other book. It contains true and vivid pictures of the Royal courts of Assam and Tripura. besides the manners and decorum used to be observed therein. The top-heavy set-up of the Government of Tripura and the burning of the widows are depicted with care. The state-festival of Madan Puja (the worship of Eros) was also prevalent in Tripura like other places e.g. Rangpur (Bengal) Dhubri, Kochbihar and Jalpaiguri. This was the greatest festival of the Rajbansis used to be held outside their villages on the Sukla Troyodasi of the month of Chaitra. The power mongering of the nobilities of Tripura and their concerted efforts to drive out the existing rulers are the striking features of this book. The characters of Rajdurlav Naran, the Kotwal Musib, Champakrai, the Jubraj and of Drujay Singh Thakur are ideals of loyalty. The brief account of the events of the country & the political relation with the neighbouring Mughal government of Dacca between 1626 to 1715 may be stated here as follows :—

Being agreed to pay regular tribute to the Mughals, Kalyan Manikya, ascended the throne of Tripura at 1626 A. D. He struck coins in the name of Siva and his own and offered charity to the Brahmins. He constructed the temples of Gopinath at Udaipur within the precints of Mahadev Bari in 1572 Saka and of Jaykali within the fort of Kowaligarh.[3] It took about 28 years after his reign to cimplete the temple. He brought the diety of Kali on an elephant's babck from Dharmagar through Ahmedpur (Sylhet District). Dharmagarh was formerly a religions centre of tantric Buddists. At Ahmedpur, where the diety and carrying elephant took rest, another place of worship grew up afterward.

Kalyan Manikya stopped payment of revenue to the Mughal Government afterwards and hence Shuja invaded Tripura.

[Tripura is a country extreemly strong by reason of abundance of its trees, the loftiness of its forts, and the difficulty of its roads. The Raja is

proud of his stringth and the practices of conchblowing and idol worship prevail there. Sultan Shuja during his governership of Bengal, left his eldest son Zain-ud-din Md. as his deputy in Rajmahal, came to Dacca, and sent his chief minister Jan Beg Kh. towards Tripura; but the Khan's men failed to take any of the forts of that country even after labouring for one year. At last he had to content himself with annexing the district of Mirzapru,[4] and making it the frontier of the imperial dominions. Many of his soldiers died of disease from the badness of the air.][5] Shuja was appointed Governor of Bengal in April 1639 at the age of 24 years. He served in the post up to April 1660 continuously excepting for 2 years i.e. from March 1647 March 1648 and March 1652—September 1652, when he worked as governor of Kabul. This event took place during the first period of his governorship when Tripura army was defeated. The Mughals brought with them a famous cannon made of leather.

In the Revenue Records of Bengal Subha prepared at the time Sultan Shuza in 1580 Saka (1658 A.D.) Sarkar Udaipur was recorded as a revenue paying centre.[6] After the said conquest of Prince Shuja a Mosque was constructed at Comilla in his name and a villeage named Shujanagar was gifted to the Mosque as its wakf property.[7]

Kalyan Manikya in his donation plate of 1573 Saka, wrote thus—"Sasti Sri Srijut Kalyan Manikya Deva Bisma Samar Bijayee Mahamohodoiee Rajanama desoyang Sri Karkonbarge Birajate Hanat param Rajdhani Hastinapur Sarkar Udaipur parganna Nrnagar Mouja Baurkhand..etc etc...."[8]

Henceforth all the Rajas of Tripura wrote the same language in their grants and deeds which means their subjugation of Mughal anthority. The word 'Karkonbarge Birajate' means in the midst of the scribes or ministers. The word 'Rajnama desoyang' means that he is called a Raja within the country. So we find that the word "Karkonbarge samaghyeom etc." in the donation plate of Mirja Murad Beg, a zaminder of Muradnagar (in Comilla Distrct) dated 1123 sana. 1 Kartic.[9]

About this time, the them Dutch Governor Vanden broucake aptly writes "The countries of Oedapur and Tipera are sometime Independent, sometimes under the great Mogul and sometimes even under king of Arakan".

Afterwards Kalyan Manikya observed the ceremony of Tula and distributed silver and gold of his own weight ot the Brahmins. He died at 1659 A.D.

After the death of Kalyan Manikya, his eldest son Gobinda became Raja of Tripura. His wife struck golden coins, On one side of it, the inscription of Siva and the name of the Raja and on the other side, her own name appeared. He had four other brothers viz Nakhatra Raj, Jagannath, Jadav and Rajballav. Govinda Manikya ruled Tripura for some time when his brother Nakhatra Rai went ot Dacca in order to overthrow Gobinda Manikya with the help of the Mughals. Nakhatra promised the Mughals to send two elephants annually and also to keep a surety at Dacca and obtained the Mughal army in his aid in return. Nakhatra was successful in dethroning Gobinda Manikya and became the Raja of Tripura at Udaipur and assumed the title fo Chatra Manikya. Chatra Manikya was born to the married wife of Kalyan Manikya after Kalyan Manikya became the Raja of Tripura and so he thought his right to the throne was superior to others. Chatra Manikya ruled for two years only when the nobilities of the Durbar conspired with Gobinda to dethrone Chatra Manikya. During the Short rule of Chatra Manikya Gobinda always remained at home concealing himself completely. During this period of two years, he was busy in conspiring against Chatra Manikya. When Gobinda's conspiracy became mature, he killed Chatra Manikya and became Raja of Tripura again.

Being afraid of Gobinda Manikya, Chatra Manikya's family and his near relatives left Tripura for ever and constructed a house at Rajar Deori within the town of Dacca and lived there permanently. On one side of the coins of Chatra Manikya, it is written thus—"Sri Sri Haragouri pade Maharaj Sri Srijut Chatra Manikya Deba" and on the other side "Saka 1582" below the inscription of a lion.[10]

Jean Baptist Tavernier, a French Merchant come ot Dacca at this time and he wrote thus, "Nothing is produced in Tipperah which is of use to foreigners. There is, however, a gold mine, which yields gold of very low standard; and silk, which is very coarse. It is from these two articles that the king's revenue is derived. He levies no revenue from his subjects, save that these below the rank, corresponding to that of the

nobility fo Europe, have to work for him for six days every year either in gold mine or at the silk. He sends both the gold and silk to be sold in China, and receiving silver in return, with which he coins money of the value of 10 sols. He also coins small gold money like the aspres of Turky and has two kinds of them, of one of which it takes four to make an ecu, and of the other it takes a dozen"[11]

Utsab Ray, the son of Chatra Manikya obtained the Zemindary of Kadba, Bedrabad, Amirabad and Lahar in Noakhali District from the Mughal Government.

Gobinda Manikya constructed the embankment of the river Gomti which helped the preservation of the crop on its both sides. He reclaimed land at Meherkool and constructed one temple for God "Chandranath" at Sitakunda hill. He presented salt to the people of Udaipur and settled land to the Brahamins at cheap rate. His settlement deeds were written in Bengali on copper plates. One Biswas Naran was the Uzir of Gobinda Manikya Jagannath, the father of Champak Rai, was his full brother.

Gobinda Manikya died at 1669 A. D.

After Gobinda Manikya's death, his son Ram Manikya ascended the throne. Ram Manikya created the post of Barthakur for efficient administration. He plundered Chittagong once with his army being guided by a Mughal officer. He got the temple of Tripureswari repaired in the year 1603 Saka. According to the plate which is attached to the eastern wal of Tripureswari Temple at udaipur, Ram Manikya's full name was "Sri Ranagan Ram Manikya Dharma Raj Pati". He was known as 'Dharma Raja' popularly. During and before the reign of Kalyan Manikya, the territory of Kailasahar Dvn. was lost and came under the Mughal rule of Sylhet and a Karkon was posted at Fatikroy to manage the territory. The name of the place Fatikroy is derived from the name fo Fatikroy, the karkon. Fatikroy was the son of Sona Roy, the Karkon12 The Karkons were known as Kankhoi locally. Ram Manikya sent two Pathan warriors named Sher Mustafa khan and Amal khan along with some soldiers to wipe out Tilok Roy. The last Karkon of this line. The Tripura soldiers roamed over the hills on the pretext of hunting. Suddenly they attacked the house of Tilak Roy and killed all of his family members and his retinues.[13]

Thus the present Kailasahar and Dharmanagar divisions of Tripura came again under the rule of the Maharaja of Tripura. Sher Mustafa brought his barbar and washerman form Delhi along with his family and their descendants are now settled at Kailasahar. Md. Kasir Mahmud Chowdhury was a renowned man of this line.

Balibhim Naran, the brother-in-law of Ram manikya acted as Jubraj for sometime. Champak Rai the son of Jagannath was appointed Jubaraj because of his superior qualities.

Ram Manikya died in 1683 A. D.

After the death of Ram Manikya, Ratna Manikya ascended the throne in C. 1683 A. D. at the age of seven years only. and Jubaraj Champak Rai administered the Government on his behalf. Sometime after, Narendra Deb with a view to become Raja himself went to Dacca to secure the Mughal help. He promised the Mughal Governor at Dacca to send two more elephants annually over the prevalent annual presentation of elephants and also one for the Governor himself. Thus the annual presentation of elephants numbered four. The Mughal army come to udaipur and Narendra was installed on the throne of Tripura with the title of Narendra Manikya. Champak Rai fled to Dacca. Very soon, the nobilities conspired against Narendra Manikya and requested Champak Rai to come with the Mughal army to dethrone Narendra Manikya. Champak Rai did accordingly and Narendra Manikya was defeated at a war at Chandigarh. Narendra Manikya did not do any harm to Ratna Manikya, rather he took care of him during his short reign. Narendra Manikya took shelter into the hills but was afterwards arrested and killed by the order of Champak Rai. Champak Rai installed Ratna Manikya again to the throne of Tripura at udaipur. This event took place at about 1686 A. D.

Champak Rai began to rule the country with courage and wisdom and stopped sending of elephants to Dacca. "The son of Ram Manikya Raja, Zeminder to Tipperah for a while appears to have been wholly shaken of the Mogul yoke virtually, being only liable to a nominal tribute of 25,000 rupees for the perganah of Noornagar, which at the sametime,was entirely remitted to himself in theform of a military Jaigeer from theCourt of Delhi."[14]

Champak Rai while residing at Dacca connected himself to the temple of Gooptipara in Hoogly District and patronised the institution. He was a Sakta in his religions belief. His admirers like Chandrachur Brahmachari who composed the annotation (Kalipakshya Tika) of Bidhyasundar Kabya styled Champak Rai as Maharajadhiraj Champak Roy Mahinath. The sandas issued by Champak Rai may be seen with the talukdars of Nurnagar. Champak Rai was murdered in a conspiracy in which some members of the royal family were implicated.

After the death of Champak Rai, Ratna Manikya nominated Durjaysingh Deb as Jubaraj and Ghanashyam Deb as barthakur who were his step-brothers by different mothers. Sanads of Ratna Manikya and of other Rajas may be seen at the houses of jotedars at kailasahar. Round seals containing the names of previous Rajas had been set on the bodies of them like the insingnias of the Mughal Badsas.

Fron 1608 ot 1703 A. D. Dacca was the Mughal Capital of Bengal and after that the entire Diwani staff and the agents of the Zamindars were transferred to Murshidabad. Hearing the power of Murshid Kooly Jafar Khan(1707-25), Ratna Manikya used to send elephants, wroutht and unwrought ivory and various other articles as presents to his at Murshidabad in the expectation of peaceful co-existence. Murshid Kooli in return sent Ratna Manikya khelaats or honorary dress, by the receipt of which Ratna Manikya acknowledged the Mughal's superiority. Thsi interchange of presents and khelaats became an annual custom during the whole of Murshid Koolis' administration.

Mahendra Manikya became Raja of Tripura on the 29th of Baisakh of 1634 Saka (C May 19,1712) and on the fourth day of his accession, he struck coins in his name and cut Kotwal Musib Raj Durlav Naran on this occasion. Very soon Mahendra Manikya murdered Ratna Manikya when the Mughal soldiers were still residing at Udaipur. Mahendra Manikya appointed Drujaysingh Deb as Jubaraj and Chandra Mani Deb as Barthakur. Mahendra Manikya died by the end of July 1713 and Durjaysing Jubraj ascended the throne. His reign was full of events.

It is to be mentioned here that with the help of the same Mss. of the British Museum, Rai Bahadur S. K. Bhuyan wrote a book 'Tripura Buranjee'.

In writing this book, I owe much to Mr. W. Zulf, the Asst. keeper of the British Museum, for his helping me in all respects in obtaining the Mss.; to Mr. J. J. W. Simpson, Photographic Service, The British Museum for recording the microfilm nicely; to Sreejut Ram Kanta Barthakur, Senior Accountant, Air Training centre, Chardwar, assam, for his helping me in determing the correct implications fo old Assamese words; to Sreejut B. K. Bhattacharjee M. A. LL. B. Advocate, Agartala for his assisting me generally and Social Education Dept., Education Directorate, Tripura for their making arrangements for studing the said microfilm and I offer them my sinceredt and heartfelt thanks.

The 1st August. Tripur Chandra Sen

1964, Agartala,

Tripura.

---

1. The present name of the place is Nazira. It is situated at the South-West of Sibsagar Town.
2. Tamra Dhwaja Narayan was the Raja of Kachar at that time.
3. At present it is known as Kamalasagar.
4. It is situated at about three miles north-east of Kamalasagar in Comilla District.
5. Naubahar-i-Murshid Quli Khani as translated by Jadunath Sarkar in Bengal Past and Present-vol. LXIX, Serial No. 132 page 1.
6. Rajmata by K. C. Singha P. 84
7. Rajmata by K. C. Singha P. 94
8. Rajmata by K. C. Singha P. 592
9. Rajmata by K. C. Singha P. 560
10. Rajmata by K. C. Singha P. 86
11. Travels in India by Jean Baptiste Tavernier by V. Ball, vol II; as published by Mac Millan and Co, London. P. 275 & 276.
12. Fatik Royer, Itihash Samaj Patrika, dated 25th Feb. 1956.
13. Sri Sri Juter Kailasahar Bhraman (Bengali) by Chandroday Bidhyabinode.
14. Grant's view of Revenues of Bengal. (Fifth Report, P. 365-96.)

মুখবন্ধ

ত্রিপুর চন্দ্র সেন একটি শ্রদ্ধেয় নাম। পেশায় তিনি ছিলেন আগরতলার একজন আইনজীবী। কিন্তু ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর অনুরাগ অনেক শিক্ষাবিদদের চেয়ে বেশী ছিল। ইংরাজীতে লিখিত (১৯৭০ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত) তাঁর পুস্তিকা 'ত্রিপুরা ইন ট্রানজিশন' এবং বাংলা গ্রন্থ 'সৃষ্টি প্রথম বা লক্ষ্মী পালা' এবং তাঁর সম্পাদিত 'গোজেন লামা' এবং 'ত্রিপুরা দেশের কথা' ত্রিপুরা প্রেমী সকলেরই অবশ্য পাঠ্য। সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজের সামান্য রোজগারের ওপর ভিত্তি করে, অনেক বাঁধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি একটার পর একটা গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। এইসব গ্রন্থ গবেষকদের কাছে এক বড় সম্পদ। ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র ত্রিপুর চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ত্রিপুরা দেশের কথা (১৬২৬-১৭১৫খৃঃ)' পুণর্মূদ্রণের ব্যবস্থা করে একটা অভিনন্দন যোগ্য কাজ করলেন। কারণ সেন মশাই এর অধিকাংশ বই আজ বাজারে পাওয়া যায় না।

'ত্রিপুরা দেশের কথা' একটি অহমিয়া পান্ডুলিপির বঙ্গানুবাদ। রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্য তৎকালীন অহম রাজা স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ'র প্রতিনিধি হিসাবে তিনবার ত্রিপুরা রাজ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১২) মহারাজা মহেন্দ্র মাণিক্যের (১৭১২-১৪ খৃঃ) এবং মহারাজ দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের (১৭১৪-২৯খৃঃ) রাজত্ব কালে এই সফর হয়েছিল। সেদিনের ভ্রমণ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই অহমিয়া ভাষায় লেখা হয়েছিল 'ত্রিপুরা দেশের কথা'। আগরতলা থেকে লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাথে যোগাযোগ করে মাইক্রোফিল্মের মাধ্যমে এই পান্ডুলিপি আনিয়ে অনুবাদ ও প্রকাশ করেছিলেন প্রয়াত ত্রিপুর চন্দ্র সেন। কতবড় বিদ্যোৎসাহী হলে তবে এটা সম্ভব হয়, কারণ এই কাজের বিনিময়ে অর্থ, ডিগ্রি বা খেতাব কিছুই ত্রিপুর চন্দ্র সেন মশাই পান নি। অন্যদিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এই একই পান্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে আসামের রায় বাহাদুর এস, কে ভুঁইঞা 'ত্রিপুরা বু. কুঞ্জী' লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৪৭ টি বল্কলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা এই পান্ডুলিপি আমাদের দেশে অনাদৃত থাকলেও বিদেশে ঠিকই মর্যাদার আসন পেয়েছিল। এরই জন্য সুদূর লন্ডন থেকে পান্ডুলিপিটি সংগ্রহ করতে হয়েছিল ত্রিপুর বাবুকে।

ভ্রমণকারী বা পর্যটকদের ডায়েরী বা বিবরণী থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়কে জীবন্ত ভাবে দেখা যায়। তাই পর্যটকদের বিবরণী ইতিহাসের এক মূল্যবান উপাদান। ছত্রমাণিক্যের সময় ফরাসী দু'জন বিখ্যাত ভ্রমণকারী ট্যাভার্নিয়ার ও বর্ণিয়ার ভারতের অনেক জায়গা ঘুরেছিলেন। ট্যাভার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তৎকালীন ত্রিপুরা রাজা সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে। একজন বিদেশীর চোখে আমাদের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা কেমন এটা জানতে কে না চায়। একই ভাবে প্রতিবেশী আসামের চোখে ত্রিপুরার ছবি যা 'ত্রিপুরা দেশের কথা'য় লিপিবদ্ধ আছে— অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ভাল লাগার কথা। শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে, পান্ডুলিপিটি লেখা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আর আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য এক জায়গায় ত্রিপুরা থেকে আসামে কিভাবে যাওয়া যায় জানতে চাইছেন। সুতরাং আজকের চোখে সেদিনের বিবরণ খুব একটা সহজবোধ্য হওয়ার কথা নয়। সেদিনের ত্রিপুরার ছবি বা অনেক নামের সাথে আজ মিল নেই। রাজাদের রাজত্ব শেষ, সুতরাং সেদিনের রাজসভার জাঁকজমক ও সমারোহ, অঙ্গাবরণ বা পোষাক-পরিচ্ছদের ঐশ্বর্য যা বর্তমান পুস্তকটির বিভিন্ন পাতায় বিস্তৃতভাবে আছে, আজকের অনেক পাঠকের চোখেই হয়তো গল্পকথার কাহিনী বলে মনে হতে পারে। তবু ইতিহাসে কোনও কিছুই অপাংক্তেয় নয়। তাঁরা শিল্প ইতিহাস, অতীতের রাজসভা, কিংবা পুরণো দিনের পোষাক পরিচ্ছদ বা অস্ত্র-শস্ত্র বা রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতে চান তাদের কাছে এই গ্রন্থের নিখুঁত বর্ণনা এক বিরাট সম্পদ বলে মনে হবে। আসলে, অতীতকে দেখার চোখের উপরই সবকিছু নির্ভর করে। সবার কাছে তো সব জিনিষ একইভাবে ভাল লাগার কথা নয়।

আসামের সাথে ত্রিপুরার সম্পর্ক মধুর করার ব্যাপারে সেই সময়ে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের ঘনিষ্ট ত্রিপুরার এক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আনন্দিরাম মেধির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আনন্দিরাম মেধি তৎকালীন আসামের রংপুর-এ (বর্তমান নাজিরা) অহম দরবারে রুদ্র সিংহের সাথে দেখা করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে এই কাহিনীটি আছে। এক রাজ্যের সাথে অন্য রাজ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছু নিয়ম রীতি থাকে। আসামেও বড় বড়ুয়ার মাধ্যমে যোগাযোগের রীতি ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রভাবশালী বড় বড়ুয়া সুরথ সিংহকে ভিন্ন কথা বলে আনন্দিরামের সাথে রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগীকে ত্রিপুরায় দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের দরবারে পাঠিয়েছিলেন আসামের রাজা স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ। সময়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ । ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। সেই সুযোগে মুঘল -বিরোধী শক্তি জোট গঠনের অভিপ্রায়ে আসামের স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ দু'জন দূত পাঠিয়েছিলেন ত্রিপুরার দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের দরবারে।

সেই সময় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল উদয়পুরে। (উদয় মাণিক্য ১৫২৭ - ১৫৭৩ রাঙ্গামাটির নাম পরিবর্তন করে নিজের নামানুসারে 'উদয়পুর' করেন)। আসামের দূতগণকে স্বাগত জানিয়ে

দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার ও উদয় নারায়ণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে মোট দশজনকে রুদ্র সিংহের দরবারে পাঠালেন। পথে সপুরের রাজা ত্রিপুরার দূতগণকে সংবর্ধনা জানালেন। উদয়পুর থেকে যাত্রার প্রায় একবছর পরে ত্রিপুরার দূতগণ গজপুরে এলেন এবং রংপুরে স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের সাথে সাক্ষাত করলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে আসামের দূতদের সাথে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও উদয় নারায়ণ বিশ্বাসের সাথে উদয়পুরের পথে দ্বিতীয় যাত্রা শুরু হল এবং তাঁরা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজধানীতে আসার পর ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে এপ্রিল রাজ দর্শন লাভ করেন। ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য আসামের দূতরা দু'জন গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। কারণ এই দ্বিতীয় বিধিবদ্ধ সরকারী সফরে রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগীর সাথে চৌত্রিশ জন পাইক বরকন্দাজ ইত্যাদি ছিল। এই সব গুপ্তচরদের বিবরণের উপর নির্ভর করেই আসামের দূতরা সেদিন প্রাসাদের অভ্যন্তরের অনেক গোপন কথা তাঁদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন যেগুলি বর্তমান পুস্তকে স্থান পেয়েছে। এতদিন ত্রিপুরার ইতিহাস ছিল 'রাজমালা' নির্ভর, যাতে রাজবন্দনাই গুরুত্ব পেত। কিন্তু আসামের দূত ত্রিপুরায় শুধু রাজবন্দনা করতে আসেন নি। তাঁদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। প্রকৃত বাস্তব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অহম রাজাকে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এরই জন্য দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য ও দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের প্রথম দিকের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে গেলে 'ত্রিপুরা দেশের কথা'র গুরুত্ব ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে বিরাট।

ত্রিপুরা রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ, দুর্গ, মন্দির, রুপার দুয়ারী ও সোনার দুয়ারী ঘর, বড়লোক ও পাত্র মন্ত্রীদের বর্ণনা— যেমন যুবরাজ, বড় ঠাকুর, উজীর, নাজীর, নেমুজী, কারকুন, কোতোয়াল, মুহ্বি, দেওয়ান থেকে শুরু করে পূজা পদ্ধতি ও উপাচার, সিংহাসনের বর্ণনা, পুকুর ও গোমতী নদীর বিবরণ পড়তে পড়তে এক ভিন্ন ত্রিপুরার জীবন্ত ছবি আমরা পাই। সেদিনের পথ-ঘাট, পাহাড়, স্থান ইত্যাদির অধিকাংশ নাম আজ আর নেই। সেদিনের জীবন কেমন ছিল তার এক ছবি : ".....এই রাস্তার মাথায় গোমতী নদী ঘুরিয়া গিয়াছে। নদীর অপর পাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত, সেখানে ত্রিপুরারা বাস করে। তাহা ছাড়া মগ দেশ বিজয় করিয়া যে সব লোক আনিয়াছে তাহাদিগকেও সেখানে বসানো হইয়াছে। তাহারা ধান, কার্পাস ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন করে। ঐ রাস্তার পূর্ব্বদিকে ঢপলিয়া পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে ত্রিপুরাদের ঘরবাড়ি আছে। ......গোমতী নদীর অপর পাড়ে পুবে-পশ্চিমে লম্বা একটি রাজপথ আছে। সেই রাস্তার উপরে নদীর ধারে একটি বন্দর আছে। এই বন্দরে তামা, পিতল, কার্পাস, কাপড়, লবন, তৈল, ঘৃত ও অন্যান্য জিনিস আসে। সেখানে লোকেরা তাহাদের ঘরে ধান, চাউল, ডাইল, সরিষা, তামাকপাতা ইত্যাদি সাজাইয়া রাখে এবং বেচা কেনা করে। সেখানে বাংলা দেশের লোকেরা আসিয়া কাপড় ও বনজ জিনিসপত্র বেচা-কেনা করে। এইরূপে প্রতিদিন রাত্রি প্রভাত হইতে রাত্রির এক প্রহর পর্যন্ত লোকে সেখানে বেচা-কেনা করে। রাস্তার উত্তর দিকে নদীর পাড়ে দুর্জয় সিংহ যুবরাজের বাড়ি আছে। তাহার

বাড়ির চারিদিকে ইটের তৈরী গড় আছে। সেই গড়ের বাহিরে ইটার ভিটার উপর একটি চৌচালা ঘর আছে; সেখানে বসিয়া তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। সেই ঘর হইতে পশ্চিম-উত্তরদিকে বাঙ্গালী লোকদের বাড়ী আছে। (দশম অধ্যায়) আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে রাজধানী উদয়পুরের একাংশের ছবি। সেদিন পানীয় জলের একমাত্র উৎস দীঘিময় ত্রিপুর রাজধানীর বর্ণনাও কম আকর্ষণীয় নয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজধানী উদয়পুর পরিত্যক্ত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। বন্দরের কথা শুধু বইয়ের পাতায় বন্দী থাকে এবং লোকচলাচল বিবর্জিত হয়ে প্রাণবন্ত উদয়পুরের অনেকাংশই অরণ্যের অধিকারে চলে যায়।

ত্রিপুরার অভ্যন্তরে সেদিন পথ-ঘাট ছিল না বললেই চলে। উদয়পুর থেকে কৈলাসহর যেতে আট-দশদিন লাগত। আসামের দূতরা হয় পদব্রজে, অথবা নৌকাযোগে, মাঝে মাঝে আবার হাতী বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে একস্থান থেকে অন্যত্র গেছেন এবং তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। পথিমধ্যে যেসব স্থানের নাম তাঁরা উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে— যেমন, তৈজাল পাড়া, রাংরুঙ্গ, দেওগাঙ্গ, কুমজাঙ্গ, সাইরেঙ্গ চুক, থাকরাই, ছোট মরিছড়ি, বড় মরিছড়ি। যাঁরা স্থানের অতীত নাম নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের কাছে এইসব নাম নিশ্চয়ই কৌতূহল সৃষ্টি করবে। কাছাড় ও ত্রিপুরার সীমানা ছিল রূপিনী নদী। গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্রিপুরায় মদন পূজা ও গোমতী নদীতে পরস্পরের প্রতি জল ছিটিয়ে মোট খেলা এবং হাজার হাজার মানুষের মিলনে যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার বর্ণনা আছে তা যে কোনও রসিককেই আকর্ষণ করতে বাধ্য। ত্রিপুরার রাজার দৈনিক কাজ কি ছিল সেটি পাওয়া যাবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। অন্যদিকে বর্তমান গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যাবে আসামে ত্রিপুরার দূতগণের দুর্গোৎসব দর্শন ও তর্কযুদ্ধের কাহিনী। একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য সেটি হ'ল গ্রন্থে শকাব্দের ব্যবহার এবং উভয় দরবারের বার্তা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং স্বাভাবিকভাবে উভয় ক্ষেত্রেই পণ্ডিতদের মাধ্যমে আদান-প্রদান। অবশ্য মহেন্দ্রমাণিক্য যে দূতকে রংপুরে স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন সেই অরিভীম নারায়ণ কিন্তু ছিলেন ত্রিপুরী। ১৬৩৪ শকাব্দের ৭ই মাঘ রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগীর সাথে অরিভীম নারায়ণ উদয়পুর থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং ১৬৩৫ শকাব্দের ১৩ই ভাদ্র অহম রাজধানী রংপুরে পৌঁছেছিলেন। (শকাব্দের সাথে ৭৮ যোগ করলে কত খৃষ্টাব্দ বোঝা যায়, যেমন ত্রিপুরাব্দের সাথে ৫৯০ কিংবা বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ দিলে কত খৃষ্টাব্দ বুঝতে পারি।)

রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী তাঁদের বিবরণীতে শুধু যে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য এবং দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের ছবি এঁকে গেছেন তাই নয়, ত্রিপুরার রাজাদের পূর্বপুরুষদের কথাও কিছু লিখেছেন। বর্তমান গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে ত্রিপুরার রাজাদের নামের সাথে 'মাণিক্য' উপাধিটি যুক্ত হওয়ার কাহিনী (এই কাহিনী অবশ্য 'রাজমালা'তেও আছে একটু অন্যভাবে)। বাংলার নবাবকে হাতী দেওয়ার সর্ত এবং ত্রিপুরার খণ্ডিত ও সর্তসাপেক্ষ

স্বাধীনতার কাহিনী এই পুস্তকে মিলবে। সিংহাসনের জন্য গোবিন্দ মাণিক্যের সাথে নক্ষত্র রায় বা ছত্রমাণিক্যের ভ্রাতৃবিরোধ— ত্রিপুরার যে কাহিনীর উপর নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অমর উপন্যাস 'রাজর্ষি' এবং নাটক 'বিসর্জন' রচনা করেছিলেন আসামের দূতগণের কাছে সেই ভ্রাতৃবিরোধের কাহিনীও অজানা ছিল না। গোবিন্দমাণিক্যের (১৬৬০-৭৩ খৃষ্টাব্দ) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামমাণিক্য (১৬৭৩-৮৫ খৃষ্টাব্দ) ত্রিপুরার মহারাজা হয়ে 'বড়ঠাকুর' পদ সৃষ্টি করেছিলেন যেটি সিংহাসনের অধিকার নিয়ে পরবর্তী সময়ে দ্বন্দ্ব ও জটিলতাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল। রামমাণিক্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নদেবকে 'যুবরাজ' এবং দ্বিতীয় পুত্র দুর্জয়দেবকে 'বড়ঠাকুর' পদে মনোনীত করেছিলেন। 'রাজমালা'র তথ্য অনুযায়ী রামমাণিক্যের মোট ১৩ টি পুত্র সন্তান ছিল, তার মধ্যে মাত্র ৪ জন জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা হলেন : রত্নদেব, দুর্জয়দেব, ঘণশ্যাম ও চন্দ্রমণি। আসামের দূতগণ তাঁদের বিবরণীতে রত্নদেব বনাম ঘনশ্যামের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত জীবন্ত করে এঁকেছেন (যে কাহিনী অন্যত্র মেলে না)। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর কিভাবে মুরাদ্‌বেগ এবং মামুদ ছফিকে নিয়ে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং রত্নমাণিক্যকে হত্যা করে নিজে মহেন্দ্রমাণিক্য নাম নিয়ে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন সেই ভয়ংকর প্রাসাদ কলহের নিখুঁত বর্ণনা রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস দিয়েছেন। ক্ষমতা বা সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ইতিহাসেরই এক উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাসও এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র হওয়ার কথা নয়।

দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে যখন বসেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর (অনেকটা চীনের শেষ রাজার কাহিনীর মত)। প্রথমে মামা বলিভীম নারায়ণ ছিলেন সেদিন সর্বেসর্বা। এরপর রত্নমাণিক্যকে হটিয়ে রামদেব মাণিক্যের ভাগিনা নরেন্দ্রমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের ভাই জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র চম্পক রায় কিভাবে সেদিন ক্ষমতা দখলের জন্য পৃথক পৃথক শিবিরে বিভক্ত হয়েছিলেন— সেইসব কাহিনীও এই ছোট্ট ভ্রমণ বৃত্তান্তে স্থান পেয়েছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দুর্জয় সিংহকে 'যুবরাজ' এবং ঘণশ্যাম ঠাকুরকে 'বড়ঠাকুর' পদ দিয়ে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য প্রায় ২৭ বছর ক্ষমতা টিকিয়েছিলেন, কবিশেখর নামে এক বাঙ্গালী কায়স্থের ভগিনীকে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য রাণী করে এনেছিলেন। কবিশেখরের সাথে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই সেদিন দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর মেহেরকুল পরগণায় অবস্থিত মুরাদবেগের এক সুন্দরী ভগিনীর পাণিগ্রহণে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ইচ্ছা প্রকাশ করার পরে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর ষড়যন্ত্রের জাল কিভাবে বিস্তার করলেন সেই কাহিনী বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'রাজমালা'র মতে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য নাকি ১২৫টি বিবাহ করেন। এই গ্রন্থ পড়লে উপলব্ধি করা যাবে সেদিন সতীদাহ প্রথা কত নির্মম ছিল। এক একজন 'মাণিক্য' রাজার মৃত্যুর পর সহমরণের বিবরণ বড় মর্মন্তদ!

সেদিন ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছিল হাতী। এই হাতী ধরা, হাতী বিক্রী ও হাতী উপহারকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কাহিনী রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী উপহার দিয়েছেন। মহেন্দ্রমাণিক্য তাঁর স্বল্পকাল শাসনে (১৭১২-১৪ খৃষ্টাব্দ) দুর্জয় সিংহকে 'যুবরাজ' এবং চন্দ্রমাণিক্যকে 'বড়ঠাকুর' পদে নিয়োগ করেন। মহেন্দ্রমাণিক্য (প্রাক্তন ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর) সম্পর্কে নানারকম বিতর্ক আছে। কেউ তাঁকে 'নৃশংস', 'অধার্মিক' হিসেবে উপস্থিত করেছেন, আবার কারও চোখে তিনি 'কন্দর্প'-এর মত সুন্দর, 'কল্পতরু'-র মত দানশীল, 'কুবের'-এর মত ধনপতি ইত্যাদি। যাই হোক, আসামের দূতদের চোখে কিন্তু মহেন্দ্রমাণিক্য সেইরকম সম্মানের আসন পাননি। রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস তৃতীয়বার বা শেষবার যখন উদয়পুরে আসেন তখন মহেন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয়েছে এবং যুবরাজ দুর্জয়সিংহ ধর্মমাণিক্য নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেছেন। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য (১৭১৪-২৯ খৃষ্টাব্দ) পূর্বের নিয়মে যথারীতি সম্ভাষণ করেছিলেন আসামের দূতগণকে। কিন্তু অহম রাজার দরবারে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য আর কোনও দূত পাঠান নি। শুধু রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস মারফৎ অহম রাজাকে এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন : "... রত্নমাণিক্য রাজার সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর হইতে আমাদের মধ্যে উহা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের মধ্যে এই প্রীতি যাহাতে হ্রাস না হয় সেইদিকে তিনি যেন লক্ষ্য রাখেন।"

আসাম-ত্রিপুরার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে উদ্যোগ অতীতে নেওয়া হয়েছিল সেটি জানতে গেলে এটি একটি আকরগ্রন্থ, অন্য সাধারণ বই থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। ইতিহাসের কত উপাদান ছড়িয়ে আছে এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে। একটু ধৈর্য্য নিয়ে পড়লে পাঠক উপকৃত হবেন। ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণাগারকে এই দীর্ঘ মুখবন্ধ ছাপানোর জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ মহাদেব চক্রবর্ত্তী
মহাত্মা গান্ধী অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ,
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭

ত্রিপুরা দেশের কথা

প্রথম অধ্যায়

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের রণোদ্যম

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। রত্ন কন্দলী, অর্জুন দাস এই দুইজন রাজদূত দ্বারা 'ত্রিপুরা দেশের কথা' লেখা হইল। মহারাজা রুদ্রসিংহ জয়ন্তা ও কাছাড় দেশ জয় করিয়া মুসলমানের হাত হইতে বাংলা দেশ উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তারপর বাংলার মৌরঙ্গের রাজা, বনবিষ্ণুপুরের রাজা, নদীয়ার রাজা, কোচবিহারের রাজা, বর্দ্ধমানের জমিদার কীর্ত্তিচন্দ্র, বরাহনগরের জমিদার উদয় নারায়ন- এই সকলের নিকট বড়ফুকনের নামে দূত পাঠাইলেন এবং তাদের লোক এদেশে অনাইলেন। এই ভাবে রাজা ও জমিদারদের যে সমস্ত লোক আসিল বড়ফুকন মহারাজকে জানাইয়া তাহাদিগকে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং সেই সকল রাজা ও জমিদারদের জন্য উপঢৌকন ও সৌহার্দ্যপুর্ণ পত্র দিয়া তাহাদিগকে আমাদের লোক সঙ্গে দিয়া পুনরায় দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে লোক যাতায়াতের ফলে সেই সমস্ত রাজা জমিদারগণ রুদ্রসিংহের বশীভূত হইল। রুদ্রসিংহ তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন- "আমরা হিন্দু রাজাগণ বর্ত্তমান থাকিতে যবনে ধর্ম নষ্ট করিতেছে। এই কারণে যদি আমরা সকলে একমত হইয়া যবনকে দমন করিয়া ধর্ম রক্ষা করি তবে কি ফল হয় তাহা আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি ঐ সকল রাজা জমিদারদের কাছে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহারাও রুদ্রসিংহের এই কথায় সায় দিলেন।

তারপর মহারাজা রুদ্রসিংহ নিজের দেশের তীর, ধনু, ঢাল, তলোয়ার, গুলি, গাদা বন্দুক, বারুদ, নৌকা ইত্যাদি এবং নিজের ভান্ডারের অস্ত্রশস্ত্র হিসাব করিয়া দেখিলেন এবং আরও অনেক তৈয়ারী করাইলেন। লোকজনের সুবিধা অসুবিধা বিচার করিয়া প্রধান যোদ্ধা দ্বারা প্রধান ও সহায়ক সৈন্য দলের লোকদেরও তীর, ধনু এবং বন্দুক মারা শিখাইলেন। হাতীর চমক ভাঙ্গাইলেন।

সিপাহীদের ঘোড় সওয়ারের যুদ্ধ শিখাইলেন। রুদ্রসিংহ এইরূপে সব রকমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মুসলমানের দেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে যে এরূপ করা হইতেছে তাহা লোকে জানিতে পারিল না।

এইরূপে বিদেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য, গুনী-গায়ক, কারিগর এবং সাহা মহাজনের লোকদের আনাইয়া সকলকে নানা রকমের দ্রব্যাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া পুনঃ তাহাদের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাহারা আসেন নাই তাহাদের জন্য সোনা রূপা পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা নিজ নিজ দেশে থাকিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপ উপঢৌকন দেওয়াতে বাংলা দেশে মহারাজা বড় রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তারপর সেই স্থানের লোকজন লাভের আশায় আসাম রাজ্যে যাতায়াত আরম্ভ করিল; যাহারা আসিল মহারাজা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

—o—

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রীতি সংস্থাপক আনন্দিরাম মেধি

এইরূপে মহারাজার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দিরাম মেধি রাজধানীতে আসিলেন। মহারাজ ভটীয়া পাড়ার পুকুরের পাড়ে তাঁহার থাকিবার স্থান এবং খাওয়ার আয়োজন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তারপর মহারাজ রংপুরের দোল যাত্রার মন্দিরের নিকটের ঘরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মেধিও মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মেধি মহারাজের জন্য যে ভেট আনিয়াছিলেন তাহা মহারাজকে দিলেন। পরে মহারাজের আদেশে দূতেরা আসন পাতিয়া দিলে আনন্দিরাম তাহাতে বসিলেন। তারপর মেধি মহারাজের সম্মুখে সংকীর্ত্তনের ন্যায় গান করিলেন, বাঁশী বাজাইলেন এবং আড়-বাঁশী হাতে লইয়া নৃত্য করিলেন। এইরূপে মহারাজ সেইদিন আনন্দ ভোগ করিয়া মেধিকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। সংকীর্ত্তন শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের এখানের সঙ্গীতজ্ঞদের মহারাজা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজার পিতা গদাধর সিংহের গয়াশ্রাদ্ধ করার জন্য তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্বে পাঠান হইয়াছিল। তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসার সময়ে ঢাকার সুবংশ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিলেন। পরে মহারাজ রত্নকন্দলীকে ভট্টাচার্য্যের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য আবার রত্নকন্দলীকে রাঙ্গামাটি হইতে সুবংশ রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন "গুণী-গায়ক যাহা পাওয়া যায় সেখান হইতে সঙ্গে করিয়া আনিও।" পরে রত্নকন্দলী সুবংশরায়ের নিকট গেলে সুবংশরায় রত্নকন্দলীকে বলিলেন, "শুনিয়াছি রুদ্রসিংহ মহারাজা জয়ন্তিয়া ও কাছাড় দেশ জয় করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া লইয়াছেন। ত্রিপুরার রাজা একজন বড় রাজা। তাঁহার সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া লইলে অনেক কার্য্যে স্বর্গদেব তাঁহার সাহায্য পাইবেন।" পরে সেই কথা রত্নকন্দলী আসিয়া মহারাজাকে জানাইলেন। এই কথা মহারাজার স্মরণ ছিল।

তারপর মহারাজা মেধিকে ত্রিপুরার রাজার সহিত তাহার প্রীতিভাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। মেধি বলিলেন, "ত্রিপুরার রাজা রত্ন মাণিক্যের নিকটে আমি গিয়াছিলাম; তাঁহার সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রীতি আছে।" তখন মহারাজা আবার বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি মেধির

সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার প্রীতি থাকে তবে মেধি আমি পাঠাইয়াছি এই কথা গোপন রাখিয়া দূত যোগে পত্রদ্বারা ত্রিপুরার রাজার সহিত আমার প্রীতি সংস্থাপন করুক।" তখন মেধি মহারাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে "মহারাজার দূত আমার সঙ্গে যাইবে। আমি তাহাদিগকে আমার বাড়িতে লইয়া গিয়া ত্রিপুরার রাজার নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইব। যদি ত্রিপুরার রাজার স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতি করিবার ইচ্ছা থাকে তবে আমি স্বর্গদেব মহারাজার লোকদের সঙ্গে লইয়া গিয়া ত্রিপুরার রাজার কাছে উপস্থিত হইব এবং যাহাতে ত্রিপুরার রাজা দূতের সঙ্গে পত্র দিয়া প্রীতি সংস্থাপন করেন আমি সেই চেষ্টা করিব।" পরে স্বর্গদেব মেধিকে বিদায় দেওয়ার সময় নিম্নের জিনিসগুলি দিলেন— হাতী একটি, সোনার খাড়ু, বালা, কানফুল ও কৌটা এবং রূপার থালা, তাওকিন, বাটি ও পানের বাটা। তাহা ছাড়া সোনা, রূপাও অনেক পরিমাণে দিয়া মেধিকে সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর রত্নকন্দলী ও অর্জ্জুনকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন।

মেধি তাহাদিগকে বাড়িতে লইয়া গিয়া ত্রিপুরার রাজার নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ জানাইলেন। ত্রিপুরার রাজা এই সংবাদ শুনিয়া "আনন্দিরাম মেধিকে সত্বর নিয়া আস" এই কথা বলিয়া দুইজন ভাল লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই দুইজন লোক আসিয়া মেধিকে লইয়া গেল এবং আমাদিগকেও সঙ্গে করিয়া লইল। রাজধানীতে (উদয়পুরে) পৌঁছিলে আমাদিগকে থাকিবার জন্য বাসা দেওয়া হইল। বাঙ্গালী নিয়মে আমাদের সিধা দেওয়া হইল। আমরা মেধিকে বলিলাম মহারাজ রুদ্রসিংহ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন এরূপ বলিবেন না। বড়বড়ুয়া নবাব গঙ্গাজল নেওয়ার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন এইরূপ বলিবেন।" তারপর মেধি ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের নির্দ্দেশমত রুদ্রসিংহ মহারাজার গুণকীর্ত্তণ করিলেন এবং বলিলেন যে স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপিত হইলে ত্রিপুরার মহারাজের অনেক কার্য্যেই সুবিধা হইবে। রত্নমাণিক্য রাজা রুদ্রসিংহের গুণকীর্তির কথা শুনিয়া তাহার সহিত প্রীতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তাহাদের দেশে আমাদের লোক কখনও যাতায়াত করে নাই, আমাদের লোক কিরূপে সেখানে যাইবে?" তখন মেধি বলিলেন "বড়বড়ুয়া নবাব গঙ্গাজল লইয়া যাইবার জন্য দুইজন ভাল লোক পাঠাইয়াছেন। মহারাজের ইচ্ছা হইলে তাহাদের সঙ্গে আমাদের দূত পাঠান যাইতে পারে।" তখন রাজা মেধিকে বলিলেন "সেই লোকদের আমার কাছে নিয়া আস।" এই কথা বলিয়া মেধিকে আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

—o—

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরা রাজার সম্মুখে আসামের দূত

পরে মেধি আমাদিগকে নিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন। তখন রাজা দেওয়ানকে দিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করাইলেন "তোমরা কি কাজের জন্য আসিয়াছ?" আমরা বলিলাম, "বড়বড়ুয়া নবাব গঙ্গাজল লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" দেওয়ান বলিলেন, "স্বর্গদেব রাজার সঙ্গে আমাদের মহারাজার প্রীতি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। দূতযোগে পত্র দিলে তোমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কি?" তখন আমরা বলিলাম "অনেক রাজারা প্রীতি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বড়বড়ুয়া নবাবের কাছে মানুষ পাঠায়, পরে বড়বড়ুয়া নবাব স্বর্গ মহারাজকে জানাইয়া তাঁহার সহিত প্রীতি স্থাপন করায়। যদি আপনাদের এইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে আমরা বড়বড়ুয়া নবাবকে জানাইতে পারি।" পরে মেধির সঙ্গে আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমাদের দুইজন (রত্নকন্দলী ও অর্জ্জুন) কে সিধা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। রাজা বড়বড়ুয়া নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। আমরা বলিলাম যে আমাদের বড়বড়ুয়া নবাবের নাম সুরত সিংহ। তারপর ত্রিপুরার রাজা রুদ্রসিংহ মহারাজার নামে প্রীতিপূর্ব্বক পত্র লিখিলেন এবং বড়বড়ুয়া নবাবের নামেও একটি পত্র লিখিলেন। আসাম রাজদরবারে ত্রিপুরার দূত পাঠান স্থির হইল।

রাজার আদেশে আনন্দিরাম মেধি আমাদের দুইজনকে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করাইলেন। বড়ঠাকুর বলিলেন—"রত্নকন্দলী, অর্জ্জুনদাস, তোমরা বড়বড়ুয়া নবাবের কাছে বলিও যে পূর্ব্বে স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে আমাদের প্রীতি বা অপ্রীতি কিছুই ছিল না। বর্ত্তমানে আমাদের মহারাজা স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দূত যোগে পত্র ও উপঢৌকন পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যে প্রকারে এই প্রীতির বন্ধনটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহা করিও।" আরও বলিলেন, "সমস্ত কাজ রাজমন্ত্রীরাই করে। তোমরা স্বর্গ রাজার বিজ্ঞ মন্ত্রী, যাহা উচিত হয় তাহাই করিও।" তখন আমরা দুইজনে বলিলাম, "ঠাকুর সাহেব, আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিলেন আমরা সেইরূপ ভাবে বড়বড়ুয়া নবাবের নিকট জানাইব।" তারপর বড়ঠাকুর আমাদের দুইজনকে পানসুপারি দিয়া আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরে মেধির সঙ্গে আমাদিগকে রাজার সভায় নিলেন এবং রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও উদয়নারায়ণকে সেখানে আনাইয়া এবং সমস্ত কিছু অবগত করাইয়া রাজার আদেশে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন— "রত্নকন্দলী, অর্জ্জুনদাস, আমাদের মহারাজা স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতিস্থাপনের ইচ্ছা করিয়া রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ও উদয়নারায়ণকে পত্র ও উপঢৌকনসহ তোমাদের সঙ্গে দিয়াছেন। এই পত্র ও উপঢৌকন সহ আমাদের দূতগণকে তোমরা বড়বড়ুয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইও। স্বর্গদেব মহারাজার নিকটেও পত্র ও উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে। ঐ পত্র ও উপঢৌকন সহ বড়বড়ুয়া নবাব আমাদের দূতগণকে স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবেন। যাহাতে এই প্রীতির বন্ধনটি বিনাবাধায় উত্তরোত্তর দৃঢ় হয় তাহাই করিও।" তখন আমরা বলিলাম "মহারাজ আমাদিগকে যে সমস্ত আদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা বড়বড়ুয়া নবাবের নিকট জানাইব।" তারপর রাজা আমাদের জন্য আতলঞ্চের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা, এবং রূপার ঝালর দেওয়া পটুকা উপহার দিলেন। তাহা ছাড়া আমাদের দুইজনকে ৪০ টি রূপার টাকাও দিলেন। তারপর আমাদিগকে রাজা পান-সুপারি, ফুল-চন্দন দিয়া বিদায় দিলেন। কাছাড় রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া কাছাড়ী রাজার জন্য পত্র ও উপঢৌকন ত্রিপুরার দূতগণের নিকট দেওয়া হইল। কাছাড়ী রাজার জন্য দেওয়া উপহারের ফিরিস্তি— পাথর খচিত দুগ্‌দুগী একখানা, কিংখাব একখানা।

১৬৩২ শকাব্দের আষাঢ় মাসে ত্রিপুরার রাজা আমাদের সঙ্গে দূত পাঠাইয়া দিলেন। তারপর আমরা ত্রিপুরার দূতগণকে সঙ্গে লইয়া ত্রিপুরার রাজধানী হইতে আট দিনের পথ আসিয়া কৈলাসহর পরগণায় বর্ষাকালে উপস্থিত হইলাম। তখন সঙ্গের লোকজন অসুস্থ হইয়া পড়াতে সেখানে চারি মাস কাল থাকিতে হইল। আমরা সেখান হইতে রওনা হইয়া কাছাড়ী রাজার রাজধানী খাছপুরে পৌঁছিলাম। কাছাড়ী রাজা ত্রিপুরার রাজার দূত দুইজনকে দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং দূতগণ কাছাড়ী রাজার পত্র এবং উপঢৌকন তাঁহাকে দিলেন। কাছাড়ী রাজার নিকট পত্র দেওয়ার সময়ে পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম লেখা হয় নাই। কারণ পত্রে ত্রিপুরা রাজার নামের নীচে কাছাড়ী রাজার নাম লিখিলে কাছাড়ী রাজা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং কাছাড়ী রাজার নামের নীচে ত্রিপুরা রাজার নাম লিখিলে তাহাও অনুচিত হয়। এই জন্যই পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম দেওয়া হয় নাই। পত্রের উপর ত্রিপুরা রাজার নামের মোহর হইতেই ত্রিপুরা রাজার পত্র বুঝাইবে— এইরূপ স্থির করিয়া কাছাড়ী রাজার পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম না দিয়া নামের মোহর দেওয়া হইয়াছিল। কাছাড়ী রাজার সম্মুখে পত্র পড়া হইলে রাজা বলিলেন, "পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম নাই, এই পত্র কাহার কিরূপে বুঝা যাইবে?" ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, "ঐ পত্রে আমাদের রাজার নামের মোহর আছে, তাহাতেই এই পত্র যে ত্রিপুরা রাজার পত্র তাহা বুঝা যাইতেছে। যেখানে পত্রের গর্ভে রাজার নাম লেখা থাকে না সেখানে এইরূপ পত্র ব্যবহারের নিয়ম আছে।" তারপর কাছাড়ী রাজা ত্রিপুরার দূতগণকে তাহাদের থাকিবার জায়গায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের জন্য সিধা এবং সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য পত্র দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আসামে ত্রিপুরার দূত

কাছাড়ী রাজার দেশ হইতে আসিয়া আমরা রহায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে রহার চকীয়াল আমাদের থাকিবার জন্য বাসা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সেখান হইতে মহারাজার আদেশে সলাল বড় গোঁহাইয়ের লোকেরা আমাদিগকে নৌকা ও লোক দিয়া আনাইলেন। সলালের লোকেরা কলিয়াবরে আমাদের থাকিবার জায়গা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। খারৈতে মরঙ্গীয়ালেরা আমাদের থাকিবার স্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। দদায় দৈঙ্গীয়ারা আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিল। সেই বৎসর মহারাজা গজপুরে গিয়াছিলেন, আমরা গজপুরে আসিয়া তাঁহার দেখা পাইলাম। সেখানে বড়বড়ুয়া আমাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে গোঁহাই তিনজনের এবং ফুকন ডাগির লোকেরা আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। পরে মহারাজা রংপুরে আসিলেন এবং ত্রিপুরার দূতগণকে আনাইয়া ভটীয়া পাড়ায় বাসা করিয়া দেওয়াইলেন। পূর্ব্বোক্ত লোকেরাই খাওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল।

১৬৩৩ শকাব্দের আষাঢ় মাসে মহারাজার আদেশে সন্দিকাই বড়ফুকনের পুত্র বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দুইজন দূতের জন্য দুইটি জিন দিয়া সাজান ঘোড়া এবং আমাদের দুইজনের জন্য দুইটি ঘোড়া মোট চারিটি ঘোড়া দিয়া আনাইয়া ত্রিপুরার দূতগণকে জাঁক-জমক করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, তোমরা যখন রওনা হও তখন তোমাদের রাজা রত্নমাণিক্য কুশলে ছিলেন ত?" ত্রিপুরার দূতেরা বলিলেন "স্বর্গদেব, আমরা যখন আসি তখন আমাদের মহারাজা কুশলে ছিলেন"। তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন, "তোমাদের রাজা ও তাঁহার রাজ্য কুশলে থাকুক ইহাই আমার কাম্য।" তারপর মজুমদার পত্রটি পাঠ করিলেন। পত্রে গদ্যে এই লেখা ছিল—

স্বস্তি সকল গুণচয়—সমুদ্যোতিত কলেবর নানা-দান-প্রমোদীকৃত-মার্গাগণন-প্রতাপ-তপন-বিদলিত-রিপুণিকরানুকার-শ্রীযুত-সুরত সিংহ বড়ুয়া বিমলশীলেষু। প্রেমসম্পাদকো লেখবৃত্তান্ত এবং শ্রীরত্নকন্দলী, শ্রীঅর্জ্জুন দাস প্রমুখ্যাৎ ত্বদীয়াং সর্ব্বাঙ্গস্মৃতিস্বিজ্ঞায় পরমানন্দযুতোহং। অতএব

ভবদধিপনং সমীড়ে, পত্রী প্রহীয়তে সভ্যা বাপ্তাবপি দ্বৌ, কিম্বহুনা তদুক্তি বশতঃ সর্ব্বম্বিজ্ঞাতব্যমিতি। যুগরামর্ত্তু-শীতাংশুগণিতে শক বৎসরে। পঞ্চম্যাং ধবলে পক্ষে পক্ষে পত্রীচৈযা প্রহীয়তে। এই পত্র বড়বড়ুয়ার নিকট লেখা হইয়াছিল।

তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ, রাজা রত্নমাণিক্যের পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শুনা গেল। রাজা মৌখিক কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা বল।" ত্রিপুরার দূতেরা বলিলেন, "স্বর্গদেব, পত্রে যাহা লেখা আছে মুখেও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।" তারপর তাহাদিগকে থালায় করিয়া পান-সুপারি, কাঁসার বাটিতে চন্দন এবং থালায় করিয়া ফুলের মালা দিলেন। পরে বড়বড়ুয়া বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ, তোমরা বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর। আমি তিনজন ডাঙ্গরীয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া স্বর্গদেব মহারাজার চরণে নিবেদন করিব। যদি তোমাদের ভাগ্যে থাকে তবে মহারাজার চরণ দর্শন পাইতে পার।" তারপর ত্রিপুরার দূতদিগকে তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

—o—

পঞ্চম অধ্যায়

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের সভায় ত্রিপুরার দূত

শ্রাবণ মাসের দশদিন থাকিতে মহারাজ ত্রিপুরার দূতগণকে অভ্যর্থনা করার আয়োজন করিলেন। সেই সময়ে রংপুরে মহারাজার সমস্ত ঘরগুলিই ইষ্টক নির্মিত ছিল। তারপর বড় ঘরের খুঁটি, তির ও ডাসায় মখ্‌মল, কির্মিজি, নরাকাপড়, রঘুনারাণি আতলঞ্চ ইত্যাদি কাপড় দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ঘরের তির, ঠাকুরা, চটা ইত্যাদিতে কৃষ্ণচূড়া বানাইয়া তাহাতে সোনার এবং রুপার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। চালের চারিদিকে ঘেরিয়া তিনটি লাইন করিয়া পানের আকার করিয়া কাটিয়া ডিমের কুসুমের রঙ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐগুলির গায়ে রুপার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘরের ভিতরে অন্য দিন মহারাজ যেখনে বসিতেন সেই দুই ভিটার মধ্যখানে মাটি দিয়া ভিটা বাঁধিয়া মহারাজার বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল। ঐ ভিটার উপরে পাটী পাতিয়া তাহার উপর বনাত পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বনাতের উপরে সিংহাসন রাখা হইয়াছিল। ঐ ভিটার উপর চারিটি সোনার খুঁটি দিয়া উচা করিয়া একটি চান্দোয়া টানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি জালের মতন জিনিষের মধ্যে সোনা ও প্রবাল দিয়া গাঁথিয়া একটি ঝালর আকারে বানাইয়া তাহাতে মুল্যবান পাথরের কাজ করিয়া এবং কিনারা গুলিতে গোলাকৃতি করিয়া চিহ্ন দিয়া সিংহাসনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিংহাসনের উপরে সাতখানা চান্দোয়া টানান হইয়াছিল। সিংহাসনের দুই ধারে অন্যদিন মহারাজা যেখানে বসিতেন সেই ভিটার উপরে পাঁচখানি করিয়া চান্দোয়া টানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেদিন মহারাজা যেখানে বসিয়াছিলেন তাহার সামনে তিনদিকে বনাত পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তীর ধনুকধারী, ঢালী, গদাবন্দুকধারী এবং [illegible]দের আনাইয়াছিলেন। পিতলের ও রূপার দণ্ডধারী লোকদের এবং তীর ধনুকধারী, ঢালী, গদাবন্দুকধারী, বর্শাধারী ও বড়শিধারী লোকদিগকে স্থানে স্থানে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। হাতী ও ঘোড়া ডাইনে বামে দুইদিকে পিছু করিয়া রাখিয়াছিলেন। বড়ুয়া, ফুকন, রাজখোয়া, [illegible], হাজরকীয়া, দেওধাই, বাইলুঙ্গ, দেশী-বিদেশী পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, কটকী, কাকতী এবং [illegible] পূর্ব নিয়মানুযায়ী যার যার জায়গায় বসিয়াছিলেন। সেইদিন এই সভা দেবসভার মতন [illegible]।

তারপর ত্রিপুরার দুই দূতের জন্য দুইটি এবং আমাদের দুইজনের দুইটি মোট চারিটি জিন আঁটা ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া আমরা রঙ্গনাথ গোস্বামীর বাড়ির পিছনের হাতীশালায় ত্রিপুরার দূতগণকে রাখিলাম। তখন তিনজন গোঁহাই ধনুকধারী, বল্লমধারী, দাধারী এবং হাতী ঘোড়া সঙ্গে করিয়া জাঁকজমকের সহিত সভায় আসিলেন। বড়ুয়া এবং ফুকনেরাও জাঁকজমকের সহিত আসিলেন। এইরূপে সকলেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজা বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। দুইজন গোঁহাইদেব বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া মহারাজার সঙ্গে আসিয়া মহারাজার দুই ধারে বনাতের উপর বসিলেন। মহারাজার তামুলী পাঁচনী (পান সরবরাহকারী) মহারাজার পিছে নিয়মিত জায়গায় বসিল। অন্দরের স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের নিয়মিত জায়গায় বসিলেন। তারপর গোঁহাইগণ আসিয়া তাহাদের নিয়মিত জায়গায় বসিলেন। তখন ত্রিপুরার দূতগণকে আনাইলে বড়দুয়ারের সম্মুখে যেখানে লোকজন বসিয়াছিল সেখান হইতে রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার মাথায় ত্রিপুরা রাজার পত্রটি লইয়া সাত জায়গায় আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে এবং উদয়নারায়ণ প্রণাম করিতে করিতে সভার ভিতরে প্রবেশ করিলেন, পরে বসিবার জায়গায় আসিয়া রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার আশীর্ব্বাদ এবং উদয়নারায়ণ প্রণাম করিয়া বসিলেন। পাটীর উপরে সরা আনিয়া রাখা হইল। ত্রিপুরার দূতেরা উপঢৌকনগুলি তাহাতে রাখিলেন।

তারপর বড়বড়ুয়া মহারাজাকে বলিলেন, "স্বর্গদেব ত্রিপুরার রাজা রত্নমাণিক্য স্বর্গদেবের প্রীতি কামনা করিয়া পত্র ও উপঢৌকন সহ দূত পাঠাইয়াছেন। ঐ দূতগণও মহারাজার চরণে প্রণাম জানাইতেছে।" তখন রাজমন্ত্রী বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তোমরা যখন রওনা হও তখন রত্নমাণিক্য রাজ কুশলে ছিলেন ত?" দূতগণ বলিলেন, "স্বর্গদেব, আমরা যখন রওনা হই তখন আমাদের মহারাজ কুশলে ছিলেন।" তারপর বড়পাতর বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন যে রত্নমাণিক্য রাজা ও তাঁহার রাজ্য কুশলে থাকুক ইহাই স্বর্গ মহারাজের একান্ত কাম্য।" তখন মজুমদার আগাইয়া আসিলেন। ত্রিপুরার দূতের হাত হইতে পত্র লইয়া রত্নকন্দলী মজুমদারের হাতে দিলেন। মজুমদার সেই পত্র লইয়া কাথভণ্ডারী বড়ুয়ার হাতে দিলেন। তখন মহারাজার আদেশে কাথভণ্ডারী বড়ুয়া সেই পত্র পাঠ করিলেন ত্রিপুরা রাজার পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,— স্বতি প্রবল বলাহকনিকায় প্রতীকাশ গণ্ডস্থলাবিরল বিগলস্মেরেয়ধারা পুরিতাখণ্ড ভূমণ্ডল দন্তাবল পটল সমুদয় প্রলয় প্রভঞ্জন প্রতিমজব খর্ব্ব গর্ব্ব গন্ধর্ব্বগণ ক্ষুরক্ষুন্ন ক্ষৌণীতলোচ্চালিত ধূলিপটল মহোন্নতি পটিম সম্বর্দ্ধিত মার্ত্তমণ্ডল তিরস্কার গরিম সমুচ্ছায়িত বিবিধ বৈজয়ন্তীচয়চারু চেলাবলী বিচিত্র বিহায়ঃস্থল পাদতল সমুদ্ভ্রামিত চামীকর শতচন্দ্র চর্ম্মনিচয়চমৎকার সম্ভাবিত ত্রিলোকীতল সম্বর্ত্ত সমরভ্রমভর নিজাস্বজিনী নায়কগণ সমর বিজয় সমুদ্যম সমীহ গোপুরনিঃসর বৃত্তান্তাকলনভয় বিকলিতোজ্জিতালয় বিপ্রতীপ ভূপাল কুল বামালোচনানয়নাবলী বিগলিতাশ্রুধারা সমুৎপাদিত পারাপার পরিস্ফূর্জ্জৎ প্রতাপৌর্ব্ব বৈশ্বানর

জলা জলাবলীঢ় ত্রিভূবন বিবর বিসরেষু। বিধিবোধিত কণককরিতুরঙ্গ মাদ্যনেকবিধ বিতরণ কৃতার্থী কৃতার্থিসার্থ গীয়মান যশঃ প্রকাশীকৃতা শামণ্ডলেষু শ্রীশ্রীযুত স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ মহারাজ পরম পবিত্র চরিত্রেষু। শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্য দেবস্য সবিনয়নতিততি সম্পাদয়িত্রী পত্রী বিজৃম্ভতে। শ্রী আনন্দিরাম বৈষ্ণব দ্বারা শ্রীসদ্বচন ললিতামৃতমাদ্রিত মাকলয্য পরমাপ্যায়িতোহং, আবয়োরীশ্বরেণ বিজ্ঞদত্বং তথাপি পত্র সন্দেশার্থমীষদ্বসু প্রেষ্যতে শ্রীমন্তুবৎপ্রনেধি দ্বারা ত্বদীয় মঙ্গল প্রকাশাৎ শঙ্কদভিনন্দকৈঃ শ্রীমন্তাবদ্‌শৈর্ব্বয়মানন্দ পাত্রী করিষ্যামহে। অলমতি বিস্তরেণ গিরাম্, শ্রীরামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুতোদয়ানারায়ণ বিশ্বাসৌ সর্ব্বমাবেদয়িষ্যতঃ। পক্ষাগ্নিরসশুভ্রাংশুগণিতে শকবৎসরে। শুচৌ পক্ষে সিতে পত্রী পঞ্চম্যাং প্রেষিতা শুভা।। যুধিষ্ঠিরস্য সম্রাজো বিরাট দ্রোপদাবপি। দুরস্থৌ সময়ে তৌ চ সৌহার্দ্দ্যদ্ধিত কারিণৌ।।

এই পত্রের বিবরণ শুনিয়া মহারাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন— "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে রত্নমাণিক্য রাজার পত্রে যা লেখা আছে তাহা জানা গেল ; বাচনিক কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা বল।" ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, "স্বর্গদেব, মহারাজার ঋণ ও চরিত্রের কথা শুনিয়া মহারাজার সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপনের বাসনা করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" তারপর বড়পাথর বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন তোমরা বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর। রত্নমাণিক্য রাজা যে প্রীতির বাসনা করিয়াছেন প্রীতি পথে থাকিলে আমাদের মধ্যে তাহা না হইবার কোনও কারণ নাই।" তারপর রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার মহারাজাকে আশীর্ব্বাদ ও উদয়নারায়ণ প্রণাম করিলেন। এইরূপে আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম করিয়া ত্রিপুরার দূতগণ নিজেদের বাসায় গেলেন।

ত্রিপুরার দূতগণ সভা হইতে চলিয়া গেলে পর মহারাজা দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত-দ্বারা ঐ পত্রের অর্থ করাইলেন। তারপর মহারাজা অন্দরে গেলেন। ত্রিপুরার রাজা স্বর্গদেব মহারাজের জন্য যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার ফিরিস্তি— হীরা ও পাথরখচিত কলকা একটি, দুগ্‌দুগী একটি, বিলোলের তৈরী বাটের পাথর খচিত খঞ্জর একটি, গুজরাটী সোনালী রংয়ের তসরের কাপড় একটি, সোনালী রংয়ের বাদামী কাপড় একটি, কিংখাব কাপড় দুইটি, গুজরাটী সোনালী কাজ করা জিরা দুইটি, গুজরাটী সোনালী পটুকা দুইটি, বন্দরী ছিট কাপড় দুইটি, উৎকৃষ্ট চিকন টুকরা কাপড় দুইখানা, চিকন ছাহান কাপড় দুই খণ্ড এবং চিকন সাদা পাগড়ী দুইটি।

ত্রিপুরার রাজা বড়বড়ুয়ার জন্য যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার ফিরিস্তি— পাথর খচিত দুগ্‌দুগী একটি, গুজরাটী সোনালী কাজ করা জিরা একটি, সোনালী পটুকা একটি এবং কিংখাব একটি।

পরদিন হইতে স্বর্গদেবের আদেশে ত্রিপুরার দূতগণকে বড় ভাণ্ডার হইতে মাসিক হিসাবে প্রতিদিন পূর্ব্বের চারিগুণ করিয়া বৃদ্ধি করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। তারপর মহারাজ

দুর্গা পূজার মাস আশ্বিন মাসের ১৫ ই তারিখে পূর্ব্বের ন্যায় সভা করিয়া সভায় ত্রিপুরার দূত রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ও উদয়নারায়ণকে আনাইলেন। তাহারাও পূর্ব্বের ন্যায় আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম করিয়া বড়ঘরের বিশিষ্ট জায়গায় বসিলেন. তখন স্বর্গ মহারাজের আদেশে বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজ বলিতেছেন যে তিনি আজ তোমাদিগকে বিদায় দিলেন। রত্নমাণিক্য রাজা পত্রে যে কথা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর তাঁহার নামীয় পত্রে দেওয়া আছে। তোমরা মুখেও বলিও যে রত্নমাণিক্য রাজার সঙ্গে আমাদের অখণ্ড প্রীতি সংস্থাপিত হইল। এই প্রীতি যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে ত্রিপুরার রাজাও যেন সেইবিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।" তারপর ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, "ভগবতী যেন এইরূপই করেন।" এই কথা বলিয়া রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার এই শ্লোকটি বলিলেন,—

বন্ধনান্যপি বহূনি, সন্তি চেতঃ প্রেমরজ্জু বিনিবন্ধন মন্যৎ।

কাষ্ঠভেদ নিপুণোহি ষড়ঙ্ঘির্ন্নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবদ্ধঃ।।

তারপর বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন যে তোমরা আজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অন্য দিন নিজ দেশে যাইও।" এই বলিয়া দূতদিগকে তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজও অন্দরে গেলেন।

স্বর্গদেব ত্রিপুরার রাজাকে যে পত্র লিখিলেন তাহা এইঃ — স্বস্তি বারিবাহ প্রতিমানুপমকরাজস্য কেশরিগণ্ডগল স্মৈরেয়ধার পঙ্কিল মহীমণ্ডল মত্ত মাতঙ্গ দশন দারিত সমুচ্ছলদপারকুপার তরঙ্গ বলদোর্দ্দণ্ডাখণ্ড কোদণ্ড নিঃসরচ্চণ্ড কাণ্ডখণ্ডখণ্ডীকৃতারি মোক্তিকান্ত গত্যার সত্যাব তিরস্কৃত বাত তুঙ্গ তুরঙ্গকুরক্ষোদন ধূলি ধূসরতাচ্ছাদিত তুহিনকরাকারাঙ্কুশ সপ্তবিবরভিদুর ব্রধ্নানন্ত নিতান্ত বিদ্রাবিতাসিততি বিদ্ধাস্থিবৈরিবামলোচনা লোচনানবরত পতিতাম্বু সম্ভাবিত গগণরণচরবিসদ পলাশ বারিদতারকাচকোর কালীকলতকীর্ত্তি ব্রততীকুসুম কুমুদিনী কান্ত কমনীয়কপালিক পাল তুলারুচি পরিণত প্রতাপ তপন তাপিতামিতাশান্ত বিনিকায় নিরবধি মনি হেমাদি বিতরণ পূরিত বিশ্বম্ভরান্তরার্থিচয় শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্য দেব রাজবর শ্রীমদিগরীন্দ্র নন্দিনী পদসুধাংশু চন্দ্রিকা পিপৎস্বচেতঃ চকোরেষু। স্বকীয় স্বন্তস্থাবেদিকেয়ং পত্রী নিতরাং বরীবরীতিস্ম শ্রীমতামতিশয়িত শিবতমমনুঘস্রমাসাস্মহেতরাং অস্মদাকলিত বিষয়বৃন্দেষু শ্রেয়সমবেব্যত যূয়ং প্রেম্না ভবাদৃশ প্রাপিতাপসর্প সমর্পিত পত্র্যা বয়ং যাদৃশ শাতপাত্র্যক্রিয়ামহে তদাধিগময়িতুং গীর্ব্বাণগুরোর্গীরপ্যলং সমাগত পত্র্যাবয়োঃ সান্দ্রপ্রমোদোহজনি শ্রীমদ্ভবাদৃশান্ স্বানুরূপতয়োরীকর্ম্মঃ এতদবধি যথা পরষ্পর প্রণিধী সর্পণাপসর্পণে সম্বিধায়োভয়স্যান্তর-মহলাদয়িষ্যত তত্র বয়মানন্দপাত্রী করিষ্যামহে মৎপ্রস্থাপিতাপসর্প শ্রীরত্নকন্দলী শর্ম্মার্জ্জুনাসৌ সর্ব্বমাবেদয়িষ্যতঃ ক্ষেমাখ্যায়িকা পত্রী সন্দধতি কিয়চ্চ স্বীয়ত্বেনোরী-কৃত্যালঙ্করণীয়েতি কৃতং পল্লবিতেন। উভয়োস্তুল্য সম্বন্ধে সুযোধন কিরীটিনোঃ। ধনঞ্জয়মগাৎ কৃষ্ণঃ প্রীতিরেবাম্বিধা ভবেৎ। পীয়ূষস্যন্দিভানুদ্রুমনিকৃত জনিশ্বাস নেত্রাক্ষসূত্র ক্রৌঞ্চ প্রাণাপহস্ত্রানন রজনী মনি প্রাপ্ত সঙ্কেত শাকে। নির্ঘূত্যার্য্যম্নি ঘস্রংকতিচিদিযুতি থাবুর্জ্জমাসেহমলাখ্যে পক্ষে সন্দেশবাচাং

স্বাক্ষরিত বিতরা পত্রিকেয়ং ব্যলেখি। শকাব্দৰছ্ক, মাস কার্ত্তিক শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথি।

স্বর্গদেবে ত্রিপুরার রাজা রত্নমাণিক্যের জন্য যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার ফিরিস্তি ঃ— সোনার কাজ করা চাকু চারিটি, রুপার কাজ করা চাকু চারিটি, ধূপদানী দুইটি, পকড়া খড়গ চারিটি, শুক্ল চামর চারিটি, কৃষ্ণ চামর চারিটি এবং হাতীর দাঁতের তৈয়ারী গা-আঁচরা একখানা।

এক ভিন্ন পত্রে লেখা ছিল ঃ— রঙ্গিন গুটী দেওয়া নরা কাপড় একটি, নরা কাপড় সাদা একটি, নরা কাপড় সবুজ রংয়ের একটি, লাল রং একমন চারি সের, ফুলতোলা আতলঞ্চ একটি, সবুজ রংয়ের আতলঞ্চ একটি, লাল ও সাদা রংয়ের আতলঞ্চ একটি, সাদা রং এবং কাল রং একমন, সোনালী ওড়না দুইটি, সোনালী পাগড়ি দুইটি, সোনালি পটুকা দুইটি, সোনালী জামার কাপড় একখানা, কাল রংয়ের বড় বড় ফুল দেওয়া বড় কাপড় একটি, লালফুল দেওয়া বড় কাপড় একটি, দশ হাত লম্বা চিকন টুকরা কাপড় চৌদ্দ খানা, চিকন সিয়া মশারি একটি, সোনার পাথর খচিত কৌটা একটি, কলগা একটি, দুগ্‌দুগী একটি, কর্ণফুল একজোড়া, সোনার ফুল বসান ডগ্‌ডগী একটি, ত্রিপুরার রাজার জন্য এই সমস্ত উপঢৌকন দেওয়া হইল। ত্রিপুরা রাজার নিকট রুদ্রসিংহের গোপনীয় পত্রটিতে এইরূপ লেখা ছিল—

স্বস্তি নিস্তুল নিরন্তরামিত দান মান সন্তান মানিতানেক নিবৃতস্থ জনগণ গীয়মান যশোরাকাহিমকর ধবলীকৃতাম্বর নিরম্বরকোষ করবীর মত্তমাতঙ্গকায় প্রতিম বিপক্ষ বহুবিদ্রাবনজনুবীর মহিলানয়ন নির্গলিতদম্বু নিকর প্রতাপ তপন তাপ তিরোভূত তিমিরততি স্বজন পদ চতুস্পদীকৃত ধর্ম্ম ধর্ম্মাবতার জনি পবিত্রীকৃত বিশ্বম্ভর শ্রী শ্রীযুত রত্ন মাণিক্যদেব রাজবরেষু লেখনম্। রহস্য পত্রমিদং—

সমাচার এই যে জনস্রুতিতে জানা যায় যে মোগলের বিরুদ্ধ আচরণে বেদোক্ত ধর্মরক্ষা পাইতেছে না। এইজন্য যদি উহার প্রতিকারের জন্য আপনার ইচ্ছা থাকে তবে আপনার সঙ্গে যে যে বড়লোকের হৃদ্যতা আছে তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদের সামর্থ ও শক্তির বিবরণ বিশদভাবে আমার নিকটে লিখিবেন। সমস্ত লোকই ঈশ্বরের অধীন তথাপি নিজের দেশে অপরে যাহাতে বিনা পরাজয়ে অন্যায় কাজ না করিতে পারে এবং যাহাতে নিজেই ঐ কার্য্যের বাধা দিতে পারা যায় তজন্য সচেষ্ট থাকিবেন। বাকি সমাচার শ্রীরত্নকন্দলী ও অর্জ্জুন দাসের মুখে অবগত হইবেন। অধিক আর বলিবার প্রয়োজন কি, ইতি। শকাব্দ ১৬৩৩, মাস কার্ত্তিক, তারিখ ৫। ত্রিপুরা রাজার জন্য স্বর্গদেবের এই পত্রটি গোপনে একটি চুঙ্গার মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় গ্রহণ

তারপর ত্রিপুরা রাজার দূতগণকে বিদায় দেওয়ার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় সভা করিয়া বড়বড়ুয়া দূতগণকে তথায় আনাইলেন। তাহারা পূর্ব্বের মত আসিয়া বড়বড়ুয়ার ঘরে বসিলেন। তারপর বড়বড়ুয়া বলিলেন—"রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গদেব রাজা তোমাদিগকে বিদায় দিয়াছেন, অদ্য আমিও তোমাদিগকে বিদায় দিলাম। রাজা রত্নমাণিক্যের পত্রে যে সব কথা লেখা আছে তাহার উত্তর আমাদের পত্রে দেওয়া হইয়াছে। মুখেও তোমরা বলিও যে স্বর্গদেব রাজার সঙ্গে রাজা রত্নমাণিক্যের যে প্রীতির বন্ধনটি হইয়াছে তাহা যেন হ্রাস না হয় এবং তিনিও যেন তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।" আরও বলিলেন যে,—"বড়লোকের ভালবাসা অন্তরের আর সাধারণ লোকের ভালবাসা বাক্যদ্বারা হয়। যাহাতে একমনে এই প্রীতির বন্ধনটি রক্ষা হয় তোমরা সেইরূপ করিও।" সেই সময়ে দূতগণ বলিলেন—

"স্বর্গদেব, ইশ্বরী যেন এইরূপই করেন।"

বড়বড়ুয়া বলিলেন, "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, অনেকদিন হইল তোমরা আসিয়াছ। স্বর্গ মহারাজ শিকার করিবার জন্য এবং কৌতুক আনন্দ করিবার জন্য গিয়াছিলেন, আমিও সময়মত তাঁহাকে তোমাদের কথা জানাইতে পারি নাই। পরে তোমরা বলিলে যে বর্ষাকালে তোমরা যাইতে পারিবে না। এইরূপে তোমাদের যাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। এখন স্বর্গ মহারাজ উপঢৌকন ও পত্র দিয়া ত্রিপুরায় দূত পাঠাইয়াছেন। আমি ঐ দূতগণকে শীঘ্রই বিদায় দিতেছি।" তখন ত্রিপুরার দূতেরা বলিলেন—"স্বর্গদেব, বলিবার দায়িত্ব আমাদের, আপনি যেরূপ বলিলেন আমরা সেইরূপেই বলিব।" তারপর পূর্ব্বের ন্যায় দূতগণকে ফুল-চন্দন, পান-সুপারি দেওয়াইলেন। তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন,—"রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, এখন তোমরা বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অন্যদিন নিজ দেশে রওনা হইও।" তারপর অপর দিনের ন্যায় দূতগণ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার রাজার নিকটে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা এই—স্বস্তি রত্নাকর তরঙ্গরঙ্গ তুঙ্গ তুরঙ্গখুর ক্ষোদন দন্তুর ধরামণ্ডলোৎথরজো রাজ্যমানাম্বরপূরণ বারিবাহনিকায় প্রতিম মত্তমাতঙ্গ মদোদ্দাল মজ্জন্মধুব্রতান বরত ক্ষরন্নৈরেয়ধারা দ্রবীকৃত দিগন্তরাল প্রতিঘস্র বিধিয়মান মণি হেমাদিদান সন্তান সন্তার্পিতাগণননিবৃদ্ধ সজ্জনগণ গীয়মান শরদিন্দু সুন্দর যশস্তিরস্কৃত রাধেয়াদিবদান্যবৃন্দ

চিরসঞ্চিত কীর্ত্তি তারক শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্য দেব রাজবরেষু। সগৌরবপূর্ব্বক লেখনং ধিজ্ঞাপনঞ্চ। প্রথমে লিখি যে শ্রীযুতের পরম উন্নতি সর্ব্বদা কামনা করিয়া এই কুশল পত্র দিতেছে। দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত কৃপা পূর্ব্বক যে পত্র দিয়াছেন তাহার পাঠ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইচ্ছা করি এইরূপ পত্র ব্যবহার সর্ব্বদা হইতে থাকে এবং স্বর্গদেব মহারাজার সহিত শ্রীযুতের প্রীতি বাড়িতে থাকে। বাকি সমাচার আমাদের দূত শ্রীরত্নকন্দলী শর্ম্মা ও শ্রীঅর্জ্জুন দাস সাক্ষাতের গোচরে জানিবে। অধিক কি লিখিব, ইতি। শকাব্দ ১৬৩৩, মাস কার্ত্তিক, তারিখ ৫ ।এই পত্রখানা বড়বড়ুয়া ত্রিপুরা রাজাকে দেওয়ার জন্য দিলেন। ত্রিপুরা রাজার জন্য বড়বড়ুয়া যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার ফিরিস্তি— সোনার বড় কৌটা একটি এবং নরা কাপড় দুইটি।

ত্রিপুরা রাজার দূতগণকে স্বর্গদেব যে পুরস্কার দিলেন তাহার ফিরিস্তি— কাঠি দেওয়া সোনার কর্ণফুল দুই জোড়া, চারি নালের টায়রা দুই জোড়া, চিকন আতলঞ্চের জামা দুইটি, সোনালী পাগড়ি দুইটি, রূপালী চেলেং দুইটি, সোনালী পটুকা দুইটি, ঢেঁকেরী ভুনি দুইটি এবং টাকা ৪০০। রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারকে সোনা ২২ তোলা এবং উদয়নারায়ণকে সোনা ১৮ তোলা দিলেন। যদুনন্দন বৈদ্যকে দিলেন সোনার গুচ্ছ দেওয়া কান ফুল এক জোড়া, দুই ভাঁজকরা ফুল তোলা বড় কাপড় একটি, রঙ্গিন পাগড়ি একটি, সূতী জামা একটি, পাট কাপড় একটি, মজা ভুনি একটি, সোনা দশ তোলা, টাকা ১৮০। দৈত্য সিংহ, গোবিন্দ ছেকিরাই, নাপিত বৈকুণ্ঠ এবং শঙ্কর এই চারিজনকে দিলেন সোনার অন্তী চারি জোড়া, বড় কাপড় চারিটি, সূতী জামা চারিটি, রঙ্গিন পাগড়ি চারিটি পটুকা চারিটি এবং মজা ভুনি চারিটি। দুইজন দৈত্য সিংহকে দিলেন রূপা ১৬০ তোলা এবং দুইজন নাপিতকে দিলেন ১১০ টাকা, ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গের চারিজন চাকরকে দিলেন— বড় কাপড় চারিটি, বড় ভুনি চারিটি, পাগড়ি চারিটি এবং ৯২ টাকা।

বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতগণকে যে পুরস্কার দিলেন তাহার ফিরিস্তি— সূতী চিকন কাপড়ের জামা দুইটি, রঙ্গিন পাগড়ি দুইটি, পটুকা দুইটি, বড় ফুল দেওয়া বড় কাপড় দুইটি, ভুনি দুইটি এবং অন্তী দুইটি। রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারকে দিলেন ৪৫ টাকা এবং উদয়নারায়ণকে দিলেন ৩৫ টাকা, দুইজন দৈতং সিংহকে ৮ টাকা এবং দুইজন নাপিতকে দিলেন ৬ টাকা। যদুনন্দন বৈদ্যকে দিলেন ৬ টাকা এবং চারিজন চাকরের জন্য দিলেন মোট ৮ টাকা। এইরূপে পুরস্কার দিয়া বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতগণকে পাঠাইতে মনস্থির করিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্রিপুরার দূতগণকে পাঠাইবার সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজার সঙ্গে কে কে কথা-বার্ত্তা বলিয়া তাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন।" আমরা বলিলাম "ত্রিপুরা রাজার ভাই ঘনশ্যাম ঠাকুর এবং কবি পণ্ডিত নারাণ মিলিয়া রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাদের দূত পাঠাইয়াছেন। তখন বড়বড়ুয়া ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্য সোনা ৮ তোলা এবং একটি নরা কাপড় এবং কবি পণ্ডিত নারাণের জন্য সোনা ৪ তোলা দিলেন। পরে আমাদের দূতেরা অর্থাৎ আমরা ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজা হইলে পর এই ৮ তোলা সোনা ও নরা কাপড়খানা তাঁহাকে দিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

—০—

সপ্তম অধ্যায়

ত্রিপুরার দূতগণের দুর্গোৎসব দর্শন

ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় দেওয়া হইয়া গেলে পর দুর্গোৎসবের কাল আসিল। তখন মহারাজ বড়বড়ুয়াকে দিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তাহারা সেখানের দুর্গাপূজা দেখিতে ইচ্ছা করে কিনা। তাহা ছাড়া, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি আছে, সেই স্থান তাহারা দেখিতে চায় কিনা।" এই কথা শুনিয়া ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, "বড়বড়ুয়া নবাবের অনুগ্রহে যদি আমরা ঈশ্বর দর্শন করিতে পাই ; ঠাকুরাণী দর্শন করিতে পাই তবে আমাদের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।" দূতগণ এইরূপ বলিলে অষ্টমীর দিনে তাহাদিগকে আনিতে আদেশ হইল। সেইদিন আমাদের দূতেরা ত্রিপুরার দূতগণকে আনিয়া বড়মন্দিরে প্রণাম করাইল। পরে সূর্য্য, গণেশ ও নারায়ণ এই তিন দেবতার মন্দিরে তাহাদিগকে প্রণাম করাইল। মহাদেবের মন্দিরে আসিয়া মহাদেবকে প্রণাম করাইল এবং নরসিংহ গোঁসাইকেও প্রণাম করাইল। তারপর দুর্গাপূজার জায়গায় গিয়া দুর্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া আসিয়া নাট-মন্দিরের বিশিষ্ট স্থানে বসিলেন। মহারাজ যাওয়ার সময়ে ত্রিপুরার দূতগণকে আড়াল করিয়া রাখা হইল। তারপর মহারাজ বসিলে পর তাহাদিগকে পত্রিকাঘরের সম্মুখের ঘরটিতে বসান হইল।

মহারাজের সম্মুখে দেশী-বিদেশী গুণীগণ গান করিতেছিলেন। দেশী-বিদেশী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ মহারাজের দেওয়া পুরস্কারের জিনিসপত্র পরিধান করিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভায় বসিলেন। তারপর মহারাজ বড়বড়ুয়ার মারফত রত্নকন্দলীকে ত্রিপুরার দূতগণের নিকট পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের অভিপ্রায় আমাদের এ জায়গার পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে রামেশ্বর ন্যায় অলঙ্কারের বিচার হউক, রামেশ্বরই বা এ বিষয়ে কি বলে?" তখন রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার বলিলেন, "মহারাজের এই সভা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সভা, এই সভার পণ্ডিত বৃহস্পতি, এই সভায় বাক্‌যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তথাপি মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে, আমি যাহা জানি পরীক্ষা দিব।" মহারাজকে এই কথা জানাইলে মহারাজ কতক্ষণ থাকিয়া উঠিলেন। পরে এক সময়ে মহারাজ দেশী-বিদেশী পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে আনাইলেন, ত্রিপুরার ঐ দুইজন দূতদিগকেও

শুনাইলেন এবং জয়গোপালের সঙ্গে রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের তর্কযুদ্ধ করাইলেন। তারপর মহারাজ নিজেই বলিলেন,— "রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দূত হিসাবে এখানে আসিয়াছে, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ হিসাবে নয়। যদি পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ হিসাবে এখানে আসিত তবেই শুধু এরূপ তর্কযুদ্ধ হওয়া উচিত। এক্ষন একটু আমোদ করা গেল মাত্র।" এই কথা বলিয়া মহারাজ উঠিয়া আসিলেন এবং ত্রিপুরার দূতগণকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। তারপর আমাদের দুইজন দূতকে মহারাজ পুরস্কার দিলেন, যথা—কাঠি দেওয়া সোনার কর্ণফুল, আতলঞ্চের জামা, রুপালী পটুকা, সোনালী বড় পাগড়ি, ঢেঁকেরী ভুনি, দুই ভাঁজকরা ফুলতোলা বড় কাপড় এবং ৪০ টাকা। আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরায় যাইবার জন্য গোঁহাইদের লোক মোট ৩৪ জন দেওয়া হইল, তন্মধ্যে রত্নকন্দলীর সঙ্গে ১৮ জন এবং অর্জ্জুনের সঙ্গে ১৬ জন যাওয়া স্থির হইল। এই লোকদিগকে জনপ্রতি ৩ টাকা করিয়া দেওয়া হইল।

—o—

অষ্টম অধ্যায়

ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে যেখানে যাহা আছে তাহার বিবরণ

কার্ত্তিক মাসের তিন দিন থাকিতে এক সোমবারে ত্রিপুরার দূতগণের সহিত আমরা ত্রিপুরা দেশ অভিমুখে রওনা হইলাম। আমাদের ভটীয়াপাড়ার বাসা হইতে নামডাঙ্গায় গিয়া নৌকায় উঠিয়া আমরা সাতদিনে রহায় পৌছিলাম। সেখানে তিন দিন থাকিয়া পুনঃ সেখান হইতে রওনা হইয়া পাঁচ দিনে ডেমেরায় আসিলাম। এখানে আসিয়া আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। ডেমেরায় একদিন থাকিয়া পুনরায় রওনা হইয়া এগার দিনে খাছপুরে পৌছিলাম। সেখানে কাছাড়ী রাজা আমাদিগের থাকিবার স্থান ও খাওয়ার জিনিষপত্র দিলেন। কাছাড়ী রাজা ত্রিপুরার দূতগণকে দরবারে সংবর্ধনা করিলেন এবং পরে বিদায় দিলেন ; কিন্তু ত্রিপুরা রাজার জন্য পত্র বা উপঢৌকন কিছুই দিলেন না। ত্রিপুরার দুইজন দূতকে কার্পাস সুতার দোপটা কাপড় দুইখানি এবং পাগড়ি দুইটি দিলেন। খাছপুরে উনিশ দিন থাকিবার পর বড়বড়ুয়ার একজন পেয়াদা সঙ্গে দিয়া আমাদের সঙ্গে যে সলালের লোক গিয়াছিল তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কাছাড়ী রাজা আমাদের সঙ্গে নৌকা ও লোক দিলেন এবং পেয়াদাও একজন দিলেন। বড়বড়ুয়ার পেয়াদা একজন এবং রহার চকীয়াল বড়া একজন— এই দুইজন আমাদের সঙ্গে চলিল। খাছপুর হইতে অনুমান ছয় দণ্ড কালের পথ গিয়া উদারবনে মখুরা নদীতে নৌকায় উঠিয়া সেই দিনেই আমরা বরাক নদীতে পড়িলাম। এই জায়গা হইতে বরাক নদী উজাইয়া গিয়া চারদিনে লক্ষীপুরে পৌছিলাম।

সেই জায়গায় দুইদিন থাকিয়া সেখান হইতে রওনা হইয়া পাঁচদিনে কাছাড় ও ত্রিপুরার সীমানা রুপিনী নদীর মুখ পাইলাম। সেখানে কোন লোক বাস করে না। সেখানে নদীর দুই ধারে পর্ব্বত। রুপিনী নদীর মুখ হইতে তিন দিনে আসিয়া ত্রিপুরা রাজার অধীনস্থ রাংরুং এ উপস্থিত হইলাম। সেখানে বরাক নদীর দুই ধারে পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে আমাদের দেশের নাগা, ডফলাদের মত লোকেরা বাস করে ; তাহাদিগকে লোকে কুকি বলে। সেখানে অনুমান তিনশত লোক আছে। তাহাদের অস্ত্র তীর, ধনুক, ঢাল এবং নাগা যাঠি। তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিয়া ত্রিপুরার রাজা তাহাদেরই একজনকে সর্দ্দার করিয়া দিয়াছেন ; এই সর্দ্দারকে লোকে হালামছা বলে। আমাদের দেশের নাগাদের মধ্যে খুনবাউ নাগারা যেমন ঠিক সেই প্রকার। ঐ হালামছার অধীনে গালিম একজন, গাবোর একজন, ছাপিয়া একজন এবং দলৈ একজন থাকে। তাহাদের খাওয়া পরা নাগাদের মতন ; তাহারা গরু খায় না। সেই জায়গায় ত্রিপুরা রাজার একজন লস্কর

থাকে ; তাহাকে ত্রিপুরা রাজার তরফ হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই লস্করেরা মাঝে মাঝে বন্দী হয়। এই স্থানে পাওয়া যায়— গবয়, হাতীর দাঁত, গোলমরিচ, সুপারি, পান, ধান, কাওন্, তরমুজ, কুমড়া, কচু, আদা, ফুটি, করলা, বেগুন এবং তুলা। এখানে কাছাড়ী ও মেখলী দেশের লোক আসিয়া জিনিসপত্র কেনা বেচা করে। কাছাড়ী লোকেরা আনে— ছাগল, হাঁস, মুরগী, শুটকী, চাউল, লবণ, তৈল, গুড়, তামাক পাতা ও শুকনা সুপারি। মেখলী দেশ হইতে আসে— সোনা, কাঁসার থালা, কলস ও খেস্ কাপড়, রাজাকে দেওয়ার জন্য মেখলীরা যত্ন করিয়া ঘোড়া ও আনে। ত্রিপুরা দেশ হইতে আসে— পিতল, নুন, তৈল, গুড়, তামাক পাতা, শুকনা সুপারি এবং শুটকী। রাংরুং এ এই সমস্ত জিনিস আনিয়া লোকেরা কেনা বেচা করে। রাংরুঙ্গীয়াদের ত্রিপুরা রাজাকে প্রতি বৎসর দিতে হয়-ঘোড়া একটি, সোনা, হাতীর দাঁত, থালা, গোলমরিচ, খেস্ কাপড়, কার্পাস এবং গবয়। বেচা-কেনা করার জন্য কাছাড়ী রাজাকে প্রতি বৎসর দিতে হয়— গবয় একটি।

সেখান হইতে মেখলী দেশের সীমানা দুই প্রহরের রাস্তা মাত্র দূরে। এই পথে আইমূল পর্ব্বত পড়ে ; সেখানে মেখলী জাতির লোকেরা বাস করে। আমরা রাংরুং এ আসিয়া চূড়ামণি বড়ুয়ার দেখা পাইলাম। চূড়ামণিকে ত্রিপুরার রাজা পূর্ব্বেই সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে আসিয়া বরাক নদীর পাড়ে আমাদের জন্য একটি ঘর বানাইয়া উহা সাজাইয়া রাখিয়াছিল। চূড়ামণির সঙ্গে রাংরুং এর লোকেরা আসিয়া একত্র হইল। তাহারা আমাদিগের থাকিবার স্থান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সেখান হইতে কাছাড়ী রাজার নৌকা ও লোকজন ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বড়বড়ুয়ার পেয়াদা ও চকীয়ালবড়াকেও ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে আমরা এগার দিন রহিলাম। সেখানের লোকেরা আমাদিগকে বোঝা বহিবার জন্য লোক দিল। ত্রিপুরার দূতগণকে এবং আমাদের দুইজনকে মাচায় তুলিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক দিল। সর্ব্বমোট তাহারা আমাদিগকে একশত চল্লিশজন লোক দিয়াছিল। সেখান হইতে রওনা হইয়া আমরা চার দিনে রুপিনী পাড়ায় পৌছিলাম। রুপিনী পাড়া হইতে রাংরুঙীয়াদের লোক ফিরিয়া আসিল। এবার এখানের লোকেরা আমাদের মালপত্র বহিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। তাহারা আমাদের খাওয়ার ও থাকার বন্দোবস্তও করিয়া দিল। এই জায়গার লোকেরা রাংরুঙীয়াদের মতন কুকি বটে।— এই জায়গার লোকদের উপর ক্ষমতা দিয়া ত্রিপুরার রাজা একজন ত্রিপুরাকে সর্দ্দার করিয়া বসাইয়াছেন, লোকে তাহাকে মুনশী বলে।

রাংরুং হইতে ত্রিপুরা রাজার রাজধানী পর্য্যন্ত পর্ব্বত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে লোকদের বাড়িতে রাংরুঙ্গীয়াদের মতন সকল দ্রব্যই জন্মে কিন্তু পান সুপারি জন্মে না। রুপিনী পাড়ায় আমরা বার দিন বাস করিলাম। সেখানে তৈজলপাড়া নামে একটি জায়গা আছে ; সেখানের লোকেরা আসিয়া এখানের লোকদের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদিগকে পূর্বের মতন লইয়া চলিল। রুপিনী পাড়া হইতে আমরা চার দিনে ছারঠাং নদীর পাড়ে পৌছিলাম ; সেখানে কুমজাং নামে একটি পাড়া আছে, এবার সেই পাড়ার লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল এবং তৈজল

পাড়ার লোকেরা ফিরিয়া গেল। ছারঠাং নদীর পর হইতে দক্ষিণ দিকে আর নির্দ্দিষ্ট দখলকারী হইয়া থাকা লোক নাই, সাধারণ গ্রামবাসী মাত্র বাস করে। আমরা কুমজাং পাড়ায় আট দিন বাস করিলাম এবং পরে সেখান হইতে রওনা হইয়া ছয়দিনে ছাইরাংচুকে পৌঁছিলাম। রাংরুং হইতে ছাইরাংচুকের সীমা পর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক বাস করে তাহাদিগকে কুকি বলে। রুপিনী পাড়া, তৈজল পাড়া, কুমজাং এবং ছাইরাংচুক—এই চার জায়গার লোকেরা ত্রিপুরা রাজাকে প্রতি বৎসর —হাতীর দাঁত, গবয়, খেস্ কাপড়, গোল মরিচ এবং কার্পাস দেয়। ছাইরাংচুকে আমরা বার দিন রহিলাম। সেখানে দেওগাং নামে একটি নদী আছে। ঐ নদীতে বাঁশের ভেলা বাঁধিয়া তাহাতে উঠিয়া আমরা ভাটীতে নামিয়া আসিলাম এবং পরে মনু নদী দিয়া উজাইয়া এবং রাস্তায় একরাত্রি বাস করিয়া আমরা কের্পায় উপস্থিত হইলাম।

কের্পা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজধানীর নিকট পর্য্যন্ত যে সকল লোক বাস করে তাহাদিগকে ত্রিপুরা বলে। তাহারা মদ ও শূকর খায়, মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে এবং একমাসে শুদ্ধ হয়। ছোমতায়া (চোন্‌তাই) নামে একদল লোক আছে। তাহারা আমাদের দেশের দেওধাইদের মতন এবং আমাদের দেওধাইদের অনুরূপ কাজকর্ম্ম করে। কের্পা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতে যে সকল লোক বাস করে তাহারা ত্রিপুরা রাজাকে বৎসর চার টাকা করিয়া কর দেয়।

—০—

নবম অধ্যায়

ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় পৌঁছিলাম

আমরা কের্পায় তেরদিন থাকিয়া সেখান হইতে রওনা হইয়া দুই দিনে ছোট মরিছরাই, বড় মরিছরাইপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে ত্রিপুরার দূত রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার রাজাকে খবর দিবার জন্য আগে বাড়িয়া গেলেন। সেই জায়গায় আমরা চারদিন বাস করিলাম এবং পরে সেখান হইতে রওনা হইয়া চার দিনে খাকরাই নদীর ধারে আসিলাম। খাকরাই নদীর ধারে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। সেখান হইতে রাজধানী চার দণ্ডের রাস্তা মাত্র দূরে। সেই দিন উদয়নারায়ণ আমাদের পৌঁছিবার খবর জানাইয়া রাজার নিকট মানুষ, পাঠাইয়া দিলেন। সেই দিন আমরা খাকরাইতে রাত্রিবাস করিলাম। পরের দিন রাজা আমাদের জন্য সিধা পাঠাইয়া দিয়া এই বলিয়া খবর দিলেন যে "আজ তাহারা সেখানেই ভোজনাদি করিয়া থাকুক, আগামীকল্য লোক গেলে তাহাদের সঙ্গে আসিবে।" পরদিন আমরা দুই দূতের জন্য দুই ঘোড়া এবং উদয়নারায়ণের জন্য এক ঘোড়া মোট তিনটি ঘোড়া পাঠাইলেন এবং আমাদিগকে আগবাড়াইয়া নেওয়ার জন্য তীর, ধনুক ও গাদা বন্দুকধারী চল্লিশজন লোক দিয়া কালারাই নামে একজন হাজারিকে পাঠাইয়া দিলেন। অনুমান ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে আমরা খাকরাই ছড়ার পাড় হইতে ত্রিপুরার রাজা রত্নমাণিক্যের নগরে পৌঁছিলে আমাদিগকে গোমতী নদীর পাড়ে বাসা এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। চৈত্র মাসের পনর দিন গত হইলে আমরা ত্রিপুরা রাজার নগরে পৌঁছিলাম। তারপর আমাদের এবং আমাদের সঙ্গের লোকজনের জন্য একটি সিধা দেওয়া হইল। দুই দিনের পর মাসিক হিসাবে নিয়ম করিয়া আমাদের জন্য সিধা দেওয়া হইল। সিধার মাসিক জায় যথা—আমাদের দুইজন দূতের জন্য মিহি আতপ চাউল ৪ মন, মুগ ডাইল ১০ সের, মাসকলাই ডাইল ১৫ সের, খেসারি ডাইল ১২ সের, লবণ ১০ সের, তৈল ১০ সের, ঘৃত ৬ সের, চিনি ৩ সের, গুড় ১২ সের, গোলমরিচ ২ সের, আদা ৮ সের, হলুদগুঁড়া ১ সের, কালীজিরা আধ সের হিং ৪ তোলা, দারুচিনি ৮ তোলা, কবুতর ৩০ জোড়া, সুপারি ১। ১ কাহন, এবং তামাক পাতা ৮ সের। ঐগুলি ছাড়া প্রতিদিনের জন্য ধার্য্য ছিল মহিষের কাঁচা দুধ ৪ সের, মাছ ৪ সের, জ্বালানি

কাঠ ৪ ভার এবং বরজের পান ৪ আঁটি। প্রতিদিন পূজার জন্য দিত—ফুল, তুলসী, দূর্ব্বা এবং বেলপাতা। আমাদের ৩৪ জন পাইকের জন্য মাসিক দিত— মোটা চাউল ৩৪ মন, মাসকলাই ডাইল দেড় মন, খেসারী ডাইল আধ মন, লবণ দেড় মন, তৈল ৩৪ সের, আস্তহলুদ ১০ সের, ভোটমরিচ ১০ সের, গুড় ৩৪ সের, তামাকপাতা ২০ সের, শুকনা সুপারি ২ কাহন, এবং হাঁস ৬০ টি। তাহা ছাড়া যাহাতে আমাদের লোকেরা কিনিয়া খাইতে পারে সেজন্য একটি হাট বসাইয়া দিয়াছিল। আমাদের লোকদের জন্য দৈনিক দিত— জ্বালানি কাঠ ৮ ভার, পাতা ২ বোঝা, বরজের পান ৪ আঁটি। সকলের জন্য মাসিক দিত—খাসী ৫ টি এবং আট দিন পর পর পাক করার জন্য হাঁড়ি দিত ৪০ টি এবং চামারে এক পাতিল চুন দিত। কাপড় ধুইবার জন্য ধোপা এবং চুল দাড়ি কাটিবার জন্য নাপিত দিয়াছিল। তাহা ছাড়া আমাদিগের জন্য হাড়ীও দিয়াছিল। এইরূপে তাহারা আমাদিগকে যোগান দিয়াছিল।

—o—

দশম অধ্যায়

ত্রিপুরা রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ

ত্রিপুরা রাজার বাড়ির চারিদিকে ইষ্টক নির্ম্মিত গড়। ইহা উচ্চতায় ৬ হাত সমান হইবে। পরিধির হিসাবে স্বর্গদেবের রংপুরের ভিতরের দুর্গটির সমান হইবে। এই দুর্গটির সম্মুখে ঐ ইটের তৈয়ারী গড়ের সঙ্গে লাগাইয়া মাটি দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে ; ইহার উচ্চতা ও পূর্ব্ব কথিত গড়টির মতন হইবে। উভয় গড়ের দূরত্ব আমাদের দারিকিয়াল দুয়ার হইতে বড় চরার মাথার রাস্তার দূরত্বের অনুমান অর্দ্ধেক হইবে। এই একটি দুর্গ। এই দুর্গের দুয়ার দক্ষিণমুখী। ইহাতে পূবে পশ্চিমে লম্বা একটি কুঁজিঘর আছে। এই ঘরের দুইদিকে ইষ্টক নির্ম্মিত ভিটা আছে, উহা উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত হইবে। মাঝখানে রাস্তা। এই রাস্তা দিয়া জোড়া হাতী যাইতে পারে। এই ঘরের কোনও দুয়ার নাই; সারাদিন খোলা থাকে। এই ঘরে তীর, ধনু, গাদা বন্দুক, ঢাল, তরোয়াল লইয়া ৪০ জন লোকসহ একজন হাজারি থাকে। এই ঘরটিকে রুপার দুয়ারী ঘর বলে। পূর্ব্বে এই ঘরের দুয়ারে রুপার পাত মারা ছিল এবং উপরে রুপার ঘট ছিল, এ জন্য লোকে ইহাকে রুঁপার দুয়ারী ঘর বলে। রত্ন মাণিক্য রাজার পিতা রাম মাণিক্য রাজার সময়ে এই ঘরটি পুড়িয়া যাওয়ার পর হইতে আর উহাতে রুপার ঘট বা দুয়ার নাই। ঐ ঘরের পূর্বদিকে অনুমান একবাঁও (চারি হাত) ভিতরের দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত ভিটার উপরে একটি চৌচালা ঘর আছে ; তাহাতে রাজা দুর্গাপ্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। সেই ঘরের নিকটে অনুমান ৩০ হাত উঁচু একটি মন্দির আছে ; এই মন্দিরে দোলযাত্রার উৎসব হয়। এই মন্দিরের উপরিভাগে ছন ও বাঁশ দিয়া চারিচালা ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। পশ্চিমদিকে ইটের তৈয়ারি বিষ্ণুর এবং শিবের দুইটি মন্দির আছে ; ঐগুলিও উচ্চতায় প্রায় ২০ হাত হইবে। এই দুই মন্দিরের সম্মুখে ইটের ভিটার উপরে ছন বাঁশের ছাউনি দেওয়া একটি চৌচালা ঘর আছে। সেই ঘরের ভিটা হইতে এক হাত অনুমান উঁচু করিয়া মানুষ আরাম করিয়া বসিবার জন্য বাঁধিয়া দিয়াছে এবং তাহার উপরে চারিদিকে চারিটি চাল দিয়াছে কিন্তু ইহাতে বেড়া নাই। এই ঘরে ৮ জন ব্রাহ্মণ দিনরাত অবিরাম পালাকীর্ত্তন গান করে। বিষ্ণুমন্দিরে পাথরের তৈরী লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে গোপীনাথ নামে বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে; এই বিগ্রহ ব্রাহ্মণে পূজা

করে। শিবের মন্দিরে পাথরের তৈরী গণেশ ও কার্ত্তিকের সঙ্গে বৃষ আরোহণে শিবের মূর্ত্তি আছে, সেখানেও ব্রাহ্মণে পূজা করে। এই দুই জায়গার নির্ম্মাল্য প্রতিদিন রাজাকে দেওয়া হয়।

রুপার দুয়ারী ঘর হইতে কিছু দূর গিয়া আড়াআড়ি ভাবে কাঠ ও বাঁশের তৈরী একটি কুঁড়ে ঘর আছে। সেই ঘরে শাল কাঠের খুঁটি দিয়া তাহাতে কলকা কাটিয়া শির তুলিয়া দিয়াছে; [illegible] দুই মাথায় ঠাকুরার মুখ কাটিয়া ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের কাঠি, কাইম, রুয়া, পাট, বেত সমস্তই ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া রং করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাইমের উপরে [illegible] শীতলপাটি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; উহার উপরে ছন দিয়া ছাওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের উপরে একটি সোনার ঘট দেওয়া হইয়াছে। এই ঘরের মধ্য দিয়া রাস্তা; রাস্তার দুই ধারে আট [illegible] পরিমাণ উঁচু ইটের ভিটা; ইহাকে সোনার দুয়ারী ঘর বলে। এই ঘরের দুই ধারে ভিটার উপরে পাটী বিছায়, পাটীর উপরে গালিচা পাতে; এই গালিচায় বসিয়া বড় লোকেরা কথাবার্ত্তা বলে।

ত্রিপুরা রাজার দেশের বড়লোক ও পাত্র-মন্ত্রীদের বর্ণনা।

রাজবংশীয় যুবরাজ একজন—তাহার উপরে আরোয়ান ধরা হয়। ত্রিপুরা রাজার এখতিয়ার যতখানি আছে তাহার সমস্ত ক্ষেত্রেই যুবরাজের আদেশ বলবতী হয়। তাহা ছাড়া কর, খাজনা, জিনিসপত্র, হাতী-ঘোড়া চাকর, সিপাহী ইত্যাদির তিনিই ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিলে সকলকে নিয়মশৃঙ্খলা করিয়া তিনিই পরিচালনা করেন, প্রয়োজন হইলে নিজেও যান। রাজা তাঁহাকে আলাদা করিয়া গ্রাম ও পরগণা দিয়াছেন। সেইসব স্থান হইতে টাকা উঠাইয়া যুবরাজ নিজে খরচ করেন এবং সঙ্গের চাকর ও সিপাহীদিগকে দেন।

রাজবংশীয় বড় ঠাকুর একজন। তাঁহারও আরোয়ান আছে। রাজা আলাদাকরিয়া তাঁহাকেও গ্রাম ও পরগণা দিয়াছেন। তাঁহার পদ যুবরাজের নীচে। যুবরাজ এবং বড় ঠাকুরের সঙ্গে নিশানবর্দার নিশান বহন করে। যুবরাজ এবং বড় ঠাকুরের বাড়িতে প্রহরী পাহারা দেয়।

তাহা ছাড়া উজীর একজন, নাজীর একজন, নেমুজীর একজন এবং কোতোয়াল [illegible] একজন আছে। তাহারা আমাদের সেখানের বড়বড়ুয়া এবং ফুকনেরা যেমন সেইরূপ। এই সমস্ত পদবীর লোকেরা ছাড়া ত্রিপুরা রাজার সম্পত্তিতে অন্য কেহ মালিক হতে পারে না।

হিন্দুর দেওয়ান একজন। তাহাকেও রাজা গ্রাম এবং পরগণা দিয়াছেন। তিনি ঐসব জায়গা হইতে খাজনা আদায় করিয়া নিজে ব্যবহার করেন, এবং সঙ্গের লোকজনকেও দেন। দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিলে দেওয়ানকে কথা বলিতে হয়। কোনও জিনিস কাহাকেও দিতে হইলে তিনি দেন; দেশের সমস্ত বিষয়ের লেখাপড়া তিনিই করেন।

খানসামা বড়ুয়া একজন। রাজার সমস্ত ভাণ্ডারের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব চলে। অন্যান্য বড়ুয়া, হাজারি ও ভাল লোকেরা ঐ সোনার দুয়ারী ঘরে বসিয়া কাজ-কারবার করে। রাজা এই ঘরে বসেন না। এই ঘরের পূর্ব্বদিকে একটি হাতিশাল আছে। সেখানে রাজা চড়িবার জন্য দাঁতাল হাতী

এবং কুন্কী হাতি দুইটি আছে। পশ্চিম অংশে একটি ঘোড়াশাল আছে; তাতে অনুমান একশত ঘোড়া থাকে।

সোনার দুয়ারী ঘর হইতে কিছুদূর গিয়া ভিতরের দুর্গের ইটের গড়ের লাগা কাঠ-বাঁশের তৈরী একটি ঘর আছে। সেই ঘরের ভিটা ইটের তৈরী এবং ইহা অনুমান ৭ হাত উঁচু হইবে। ইহার দেওয়ালও ইটের তৈরী। প্রথম দিকের তিন কোঠার পর রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে ইটের তৈরী দেওয়াল ; তার ভিতরেও দুইটি কোঠা আছে। সেই ঘরের সামনের দিকে দক্ষিণ দিক ধরিয়া পশ্চিম অংশে শিড়িকাটা একটি রাস্তা আছে। সেই ঘরের ভিতর দিকে রাজার অন্দর হইতে আসা যাওয়ার জন্য একটি রাস্তা আছে। সেই ঘরের তিন কোঠা বাদে ভিতরের দুইটি কোঠায় রাজার সেবকেরা ছাড়া আর কেহ যাইতে পারে না। সেই ঘরে সকলে যাইতে পারে না, কেবলমাত্র রাজা যাহাকে আদেশ দেন সেই সেখানে যাইতে পারে। সেই ঘরের অপর তিন কোঠায় খাট পাতিয়া তার উপরে রঙ্গিন পাটী বিছাইয়া তার উপরে গালিচা পাতিয়া দেওয়া আছে। তার উপরে সম্পূর্ণ হাতীর দাঁতের তৈরী একটি সিংহাসন সাজাইয়া রাজা বসিবার জন্য পাতা হইয়াছে। সেই সিংহাসনের উপরে পাট কাপড়ের গদি দিয়া তার উপরে বনাত পাতা হইয়াছে। সেই বনাতের চারিদিকে সোনার ঝালর দেওয়া হইয়াছে। সিংহাসনের উপরে কিংখাব কাপড়ের তৈরী বালিশ আছে; রাজা সেই সিংহাসনে বসেন। সেই ঘরের তিন কোঠা জুড়িয়া একখানা কার্পাস সুতার তৈরী চান্দোয়া খাটান হইয়াছে। সেই ঘরের খুঁটাগুলি কর্মিজের কাপড় দিয়া মোড়ান। সিংহাসনের উপরে চান্দোয়া টানান আছে এবং সেই চান্দোয়ার মধ্যস্থলে সোনার গোলাকৃতি করিয়া কাজ করা আছে এবং সেই ঘর সব সময় এইরূপ সাজান থাকে। এই ঘরটিকে লোকে সিংহাসনের ঘর বলে। এই ঘরের ভিতর দিকের দুইটি কোঠায় রাজার জন্য সুপারি কাটা হয় এবং রাজার সেবকেরা থাকে। এখান হইতে ভিতরের দিকে রাজা যাহাকে ডাকেন সেই কেবল যাইতে পারে। এই ঘরের পশ্চিম দিকে অনুমান তিন বাঁও (বার হাত) দূরে একটি দুয়ার আছে; তাহাকে লোকে খিড়িকি-দুয়ার বলে; তার উপরে কোনও ঘর নাই। দুই ধারে দুইটি খুঁটা বসাইয়া তার উপরে একটি পাট পাতিয়া একচালা বানাইয়া উহার উপরে ইটের গাঁথনি দিয়াছে। নীচে গড়খাতের ভূমির সামনে প্রধান দুয়ার অবস্থিত। সেই দুয়ারের পশ্চিম দিকে গড়ের কিনারায় একটি ঘোড়াশাল আছে। সেখানে রাজা চড়িবার জন্য দুইটি তুর্কী, দুইটি তাজী এবং দুইটি মেখ্‌লী রাজার আনা টাঙ্গন ঘোড়া, মোট ছয়টি ঘোড়া আছে।

সেই দুয়ার হইতে অনুমান চারি বাঁও দূরে কাঠ বাঁশের তৈরী চৌচালা একটি ঘর আছে। এই ঘরের ভিটা ইটের তৈরী এবং উচ্চতায় অনুমান এক হাত হইবে। তার সামনের দিকে একটা ফাঁকা জায়গা আছে; সেই জায়গাটি ইট দিয়া বাঁধান হইয়াছে। সেই ঘর হইতে ফাঁকা জায়গাটার দিকে অনুমান এক বাঁও চওড়া করিয়া এবং এক বিঘত উঁচু করিয়া ইট দিয়া বাঁধিয়া ঐ ঘরের সঙ্গে লাগাইয়া দিয়াছে এবং ইহাতে প্রায় এক হাত উঁচু করিয়া গোল গোল বসিবার স্থান পাকা করিয়া

দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত ঘর জুড়িয়া কার্পাস তুলার সুতায় তৈরী একটি চান্দোয়া খাটান হইয়াছে। সমস্ত ঘর ব্যাপি ধারি পাতা, তার উপরে লালা পাটী এবং তার উপরে গালিচা পাতা আছে। উহার উপরে সুজনি পাতিয়া রাজা বসেন। রাজার সুজনিটি একটি টুকরা কাপড়ের উপর অল্প করিয়া তুলা দিয়া ফুল বানাইয়া তৈরী করা হইয়াছে। সেই সুজনিটির চারি ধারে পানের আকৃতিতে বনাত দিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে স্বর্ণ খচিত আছে। এই সুজনির উপরে ছোট বালিশ চারিটি এবং বড় বালিশ একটি আছে। কোন কোন সময়ে রাজা উহার উপরে বসেন। রাজা কাহাকেও ডাকিলে সে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে। একদিন আমাদিগকে সেই জায়গায় ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রাজা ভিতর হইতে সেই ঘর পর্য্যন্ত আসিবার জন্য একটি ইটের তৈরী রাস্তা আছে। সেই ঘরে ঈশান কোণে ইটের তৈরী একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে রাজা পূজাআর্চা করেন।

সিংহাসনের ঘর হইতে লম্বায় ইটের গড় আছে। সেই গড় গিয়া পিছন দিকের গড়ের সঙ্গে লাগিয়াছে। সেই গড়ের ভিতরে রাজা থাকিবার জন্য ইটের ও ছন-বাঁশের ঘর আছে। ভিতরের দুর্গের গড়খাতের কিনারায় তাল ও নারিকেলের গাছ আছে। দুর্গের বাহিরে পূর্ব্ব দিকে সোনার, রূপার ও অন্যান্য দ্রব্যের ভাণ্ডার আছে; রাজার পাটেশ্বরীর ভাণ্ডার আছে এবং ছন-বাঁশের তৈরী ১০ টি ঘর আছে। ঐ সমস্ত ঘরে জিনিস পত্রও আছে। ঐ জায়গার পূর্ব্ব দিকে অনুমান ১০০ বাঁও দূরে দুইটি ইটের তৈরী কুঠরি আছে; ঐ গুলিতে গোলা-বারুদ রাখা হইয়াছে। দুর্গের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে ঢপলীয়া পর্ব্বত। সেখানে ত্রিপুরাদের ঘর-বাড়ি আছে। তাহাদের বাড়িতে আম, কাঠাল, বেল, নারিকেল, তাল, সুপারি ইত্যাদি জন্মে। এই দুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের মাঝে মাঝে ত্রিপুরারা বাস করে। সেখানে আদা, তরমুজ, ধান, কার্পাস, কচু, কুমড়া, আলু, কাওন ইত্যাদি জন্মে।

এই দুর্গের পশ্চিম দিকে দুর্গের গড়ের কিছু দূরে গোমতী নদী বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে রাজার বাড়ির দরজার সামনে একটি হাট আছে, এই হাটকে লোকে রাজহাট বলে। এই হাটে তামা, পিতল, হিং, লবঙ্গ জাতিফল, কাপড়, কার্পাস, নুন, চিনি, বাতাসা, দুধ, ক্ষীর, ঘৃত, হলুদগুঁড়া ইত্যাদি সকল দ্রব্য আসে। এই হাটের মধ্য দিয়া রাজপথ গিয়াছে। এই পথের দুই ধারে বণিক, ব্যাপারী এবং অন্য যাহারা বাজারে কেনা-বেচা করে তাহাদের হাট উপযোগী লাগালাগি ঘর আছে। ঐ সব ঘরের সামনে দোকান আছে এবং পিছনের দিকে বেল ও নারিকেল গাছ আছে। কোন কোন ঘরের সম্মুখে ইট দিয়া বাঁধিয়া লোকে তুলসী গাছ লাগাইয়াছে এবং উহাতে প্রতিদিন পূজা করে। রংপুরের বড়দুয়ারের সম্মুখ হইতে জেরেঙ্গার পুকুর যতদূর অনুমান ততদূর ব্যাপি এরূপ লাগালাগি হাট উপযোগী ঘর রাস্তার দুই ধারে আছে। এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বাজার আছে। এই রাস্তার মধ্যস্থল হইতে অগ্নিকোণের দিকে অপর একটি রাস্তা গিয়াছে। উহা আমাদের এখানের বড়চরা হইতে ঔগুরিহাট অনুমান লম্বা হইবে। এই রাস্তার দুই দিকে কেনা-বেচা করার লোকদের ঘর আছে; সেখানে বাজারও আছে।

এই রাস্তার মাথায় ইটের ভিটার উপরে কাঠ ও বাঁশের তৈরী দুইটি চৌচালা ঘর আছে। সেই ঐ ঘরে চতুর্দ্দশ দেবতার মূর্ত্তি আছে। এই দেবতার পূজা বৎসরে এক দফে হয়। দেওধাইদের মতন ছেমতায়া (চোন্‌তাই) নামে একদল লোক আছে, তাহারা এই দেবতার পূজা করে. তাহারা সেখানে মহিষ, গবয়, শূকর, মুরগী, হাঁস, কবুতর, পাঁঠা, হরিণ, মাছ, কচ্ছপ ও মদ দিয়া এই পূজা করে। পূজার স্থানে রাজাও আসেন।

এই রাস্তার মাথায় গোমতী নদী ঘুরিয়া গিয়াছে। নদীর অপর পাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত; সেখানে ত্রিপুরারা বাস করে। তাহা ছাড়া মঘদেশ বিজয় করিয়া যে সব লোক আনিয়াছে তাহাদিগকেও সেখানে বসান হইয়াছে। তাহারা ধান, কার্পাস ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন করে। ঐ রাস্তার পূর্ব্ব দিকে জঙ্গলীয়া পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে ত্রিপুরাদের ঘরবাড়ি আছে। তাহাদের বাড়িতে আম, কাঠাল ইত্যাদি জন্মে। সেদিকে কেবলই পর্ব্বত, তাহাতে ত্রিপুরারা বাস করে। সেখানে ধান, কার্পাস ইত্যাদি শস্য হয়। ঐ পর্ব্বতের নিকট হইতে দুর্গের কিনারা পর্য্যন্ত ত্রিপুরাদের এবং বড়লোকদের বাড়ি আছে। তাহাদের বাড়ীতেও তাল নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ আছে। দুর্গের পশ্চিমদিকে দুর্গের নিকট বড় ঠাকুরের বাড়ী আছে. তার পশ্চিমদিকে ত্রিপুরাদের বাড়ী আছে। গোমতী নদীর অপর পাড়ে পূবে-পশ্চিমে লম্বা একটি রাজপথ আছে। সেই রাস্তার উপরে নদীর ধারে একটি বন্দর আছে। এই বন্দরে তামা, পিতল, কার্পাস, কাপড়, লবণ, তৈল, ঘৃত ও অন্যান্য জিনিস আসে। সেখানে লোকেরা তাহাদের ঘরে ধান, চাউল, ডাইল, সরিষা, তামাকপাতা ইত্যাদি সাজাইয়া রাখে এবং বেচা-কেনা করে। সেখানে বাংলা দেশের লোকেরা আসিয়া কাপড় ও বনজ জিনিসপত্র বেচা-কেনা করে। এইরূপে প্রতিদিন রাত্রি প্রভাত হইতে রাত্রির এক প্রহর পর্য্যন্ত লোকে সেখানে বেচা-কেনা করে। রাস্তার উত্তরদিকে নদীর পাড়ে দুর্জয় সিংহ যুবরাজের বাড়ী আছে। তাহার বাড়ীর চারিদিকে ইটের তৈরী গড় আছে। সেই গড়ের বাহিরে ইটার ভিটার উপর একটি চৌচালা ঘর আছে; সেখানে বসিয়া তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। সেই ঘর হইতে পশ্চিম-উত্তরদিকে বাঙ্গালী লোকদের বাড়ী আছে। সেই রাস্তার দুই দিকেই হাটে যাহারা বেচা কেনা করে তাহাদের বাড়ী আছে, নগরের লোকদিকেরও বাড়ী আছে। অনুমান দুই প্রহরীর পাহারার কালের সমান রাস্তা ব্যাপি তাহাদের বাড়ী আছে। এই সকলের বাড়ীতে দুই চারিটি করিয়া তাল, নারিকেল, বেল ও সুপারি গাছ আছে. এই রাস্তায় তিনটি হাট আছে।

রাস্তার দক্ষিণ দিকে চম্পক রায় যুবরাজের একটি পুকুর আছে; অনুমান ৬ পুরা জায়গা লইয়া এই পুকুরটি অবস্থিত। এই পুকুরের পশ্চিমদিকে একটি ইটের তৈরী দালান আছে। পুকুরের জলের মাঝখানে আট কোণা ইটের ভিটার উপরে আট কোণায় আটটি খুঁটা বসাইয়া তাহাতে তামার পাত মারিয়া তাহার উপর আট কোণা করিয়া তামার দোলমঞ্চ তৈয়ার করা হইয়াছে। ঐ দোলমঞ্চকে রাজা রত্নমাণিক্য কালিয়দমন অভিনয় করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই জায়গায় আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পুকুরটির চারি পাড় ইট দিয়া পাকা করা ছিল। ইহার পাড়ে ফুল, নারিকেল,

বেল, ডালিম এই সকল গাছ ছিল। রাস্তার উত্তর ধারে অনুমান আধপুরা জায়গা ঘেরাটি করিয়া পাথর দিয়া একটি গড় বানানো হইয়াছে, গড়টি উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত হইবে। এই গড়ের ভিতরের মাঠটি পাথর দিয়া পাকা করা হইয়াছে। গড়ের ভিতরে পূর্ব্ব দিকে পাথরের তৈরী একটি মন্দির আছে; ইহা উচ্চতায় অনুমান ২০ হাত হইবে। এই মন্দিরে পাথরের চুতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি আছে এই মন্দিরের উত্তরে অনুমান ১৮ হাত উচ্চ অপর একটি পাথরের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বৃষভবাহন শিবের মূর্তি আছে। সেই জায়গায় একটি পাথরের তৈরী কুঁজিঘর আছে; সেখানে পাথরের দুর্গার দশভূজা মূর্তি আছে। এই তিন জায়গায় প্রতিদিন ব্রাহ্মণে পূজা করিয়া রাজাকে নির্ম্মাল্য দেয়। পূজারী ব্রাহ্মণ থাকিবার জন্য সেখানে পাথরের একটি ঘর আছে। পালা ক্রমে একজন ব্রাহ্মণ সেখানে থাকিয়া বিগ্রহের সেবা পূজা করে।

তাহার উত্তর দিকে গোমতী নদী মোড় দিয়াছে। সেই নদীর অপর পাড় হইতে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত। সেখানে ত্রিপুবারা বাস করে এবং ধান ও কার্পাস উৎপন্ন করে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে অমর সাগর নামে একটি দীঘি আছে। উহা লম্বায় আমাদের রংপুরের পুকুরটির মতন হইবে এবং পাশে উহার অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বড় হইবে। এই দীঘির পুব পাড়ে ইট, কাঠ এবং বাঁশ দিয়া তৈরী রাজবংশীয় দুইজন ঠাকুরের বাড়ী আছে। এই দুইজনের সঙ্গে নিশান লইয়া লোক যায় এবং নাকারা বাদ্যও বাজাইয়া যায়; তাহাদের বাড়ীতে প্রহরী পাহারা দেয়। এই দীঘির চতুর্দ্দিকের পাড়ে নগরের লোকেরা, তাঁতী, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, চামার, সূত্রধর, ধোপা, বাড়ই এই সকল লোকের বাড়ী আছে। ইহার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে আরও একটি দীঘি আছে; এই দীঘির নাম বিজয়সাগর। এই দীঘি বিজয় মাণিক্য রাজা কাটাইয়া ছিলেন। বিজয়সাগর দৈর্ঘ্যে আমাদের তেলিয়াডোঙ্গার পুকুরটির মতন বড় হইবে এবং প্রস্থে উহার অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বড় হইবে। ইহার চারি পাড়ে নগরের লোকদের বাড়ী আছে। উক্ত দুই দীঘির মধ্যখানে ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মালী এই সকলের বাড়ী আছে। এই দীঘির উত্তর পাড়ে চম্পকরায় যুবরাজের তৈরী ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আছে। তাহার পশ্চিমে রাম মাণিক্য রাজার কাটানো একটি দীঘি আছে, তার নাম রামসাগর। রামসাগর বিজয়সাগর অপেক্ষা কিছু ছোট।

রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ে ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আছে; সেখানে সদাশিবের লিঙ্গ আছে। এই বিগ্রহকে ব্রাক্ষণপূজা করে। এই দীঘির পাড়ে রাজার পুরোহিত , সভাপন্ডিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বাড়ি আছে। এই দীঘির দক্ষিণে এবং পশ্চিমে দুই দিকে এক প্রহরের রাস্তা পর্যন্ত উন্নত গ্রাম। সেখানের লোকেরা চাষবাষ করে, বাড়া- খেরীও করে এবং গরু মহিষও রাখে। তাহার দক্ষিণ দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত।

পশ্চিম দিকে গ্রামের সীমানা হইতে অনুমান ছয় দন্ডের রাস্তা গেলে জঙ্গলাকীর্ণ ঢপলিয়া পর্বত পাওয়া যায়। সেই পর্বতের মাথার উপরিভাগে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিয়া মাটি দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে, উহা উচ্চতায় অনুমান ত্ম হাত হইবে। এই গড়টি লম্বায় কত বড় তাহা আমরা

বলিতে পারিব না। গোমতী নদী এই গড়ের মধ্য দিয়া গিয়া বাংলাদেশের নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। লোকে এই গড়ের নাম চণ্ডীগড় বলে। ইহাকে চণ্ডীগড় বলিবার কারণ এই যে পূর্বে অমর মাণিক্য রাজা নিজ রাজত্বের সীমানা হইতে দুই দিনের পথ সোনার গাঁও পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর সোনার গাঁয়ের খাজনাও আদায় করিয়াছিলেন। তারপর মুসলমানদের সঙ্গে আমার মানিক্যের যুদ্ধ বাধিল। সেই দিক হইতে মুসলমানেরা অমরমাণিক্যের সৈন্যগণকে খেদাইয়া আনিল। শেষে এই পর্বতে আসিয়া উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। তারপর রাজা এই পর্বতে চণ্ডী ঠাকুরাণীর পূজা করিলেন এবং পরে অনেক মুসলমান মারিয়া চণ্ডী ঠাকুরানীর অনুগ্রহে রাজা অমর মানিক্য যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তারপর রাজা অমর মানিক্য সেই পর্বতে গড় তৈরী করাইয়া তাহার নাম চণ্ডীগড় রাখিলেন। লোকে এই কারণে এই পর্বতকে চণ্ডীগড় বলে। এই গড়ে পাহাড়াদার থাকে, তাহারা ত্রিপুরা রাজার ছাড়-পত্র থাকিলে আসা-যাওয়ার লোক ছাড়িয়া দেয়।

এই গড়ের পরে ছয় দণ্ডের পথ দূর পর্যন্ত জঙ্গলের মঝ্য দিয়া রাস্তা আছে। এই জঙ্গলের পর হইতে মুসলমান রাজ্যের সীমানা দুই দিনের পথ দূরে, মাঝখানে উন্নত গ্রাম আছে। সেখানে আছে-মেহেরকুল পরগণা ১টি, খণ্ডল পরগণা ১টি, মণ্ডল পরগণা ১টি, বকছাই পরগণা ১টি, নূরনগর পরগণা ১টি, তিচিনা (তৃষ্ণা) পরগণা ১টি, তিলি পরগণা ১টি, লোননগর পরগণা ১টি , [illegible]ও পরগনা ১টি, কৈলাসহর পরগণা ১টি, লাঙ্গলীয়া পরগণা ১টি, মির্জ্জাপুর পরগণা ১টি, ভুলুয়া পরগণা ১টি, এবং ধর্মনগর পরগণা ১টি। এই সমস্ত পরগণায় ধান, কলাই, সরিষা ইত্যাদি শস্য জন্মে। তাহা ছাড়া এই সমস্ত স্থানে কার্পাস সূতার মিহি কাপড়, পটুকা, পাগড়ি ইত্যাদি জিনিষ প্রস্তুত হয়।

ধর্ম্মনগরের পশ্চিমধার হইতে এক প্রহরের রাস্তা পর্যন্ত জঙ্গল। এই জঙ্গলের পর হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানেরা বাস করে। ধর্ম্মনগরের উত্তর দিকে একদিনের রাস্তা পর্যন্ত জঙ্গল, সেখানে ধলেশ্বর গাঙ নামে একটি নদী আছে। সেখান হইতে এদিকে (উত্তরের দিকে) কাছাড়ী রাজার অধিকার। এই নদীটি কাছাড়ী রাজার রাজ্যের সীমার নিম্নদিকে আসিয়া মুসলমানদের [illegible]শীল থানার উজানে বরাক নদীতে পড়িয়াছে। ঐ বরাক নদীর এদিকে কাছাড়ী রাজার রাজত্ব। এই পরগণাগুলির মধ্য কতকগুলি হইতে ত্রিপুরার রাজা, কতকগুলি হইতে ত্রিপুরার রাজমহিষীরা এবং কতকগুলি হইতে ত্রিপুরা- রাজবংশীয়েরা খাজানা আদায় করেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য ভদ্রলোকদের মধ্যে রাজ্যের নিয়মানুযায়ী খাজানা আদায় করিবার জন্য পরগণা বিভাগ করিয়া দেওয়া আছে। রাজার নগরের দক্ষিণে গোমতী নদীর অপর পাড়ে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির আছে। উহা উচ্চতায় অনুমান ৪০ হাত হইবে। ঐ মন্দিরে ত্রিপুরা ঠাকুরানীর মূর্তি আছে। ঐ মন্দিরের অগ্নিকোণে পর্বতের ভিতরে কুণ্ডজটিয়া নামে একটি তীর্থ আছে। সেই কুণ্ডের নাম [illegible]। সেই কুণ্ডের জল সর্বদা ধোঁয়া হইয়া থাকে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে অগ্নি-শিখার মতন দেখা যায়, কিন্তু এই কুণ্ডের জল গরম নহে। ত্রিপুরা রাজার দেশের ও নগরের লেখা সমাপ্ত।

—o—

একাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরা রাজার পূর্ব্বপুরুষদের কথা

পূর্বে ত্রিপুরা রাজার পূর্ব-পুরুষদের রাজা উপাধি ছিল না । আমাদের দেশের খুনবাউ [illegible] যেমন সেইরুপ অনুকফা তমুকফা নামে তাহারা পরিচিত ছিলেন। পরে কঞ্চৌফা নামে ত্রিপুরার অকটি পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। পিতৃগৃহেতে সেই কন্যা কালের গতিতে যুবতী হইল। সেই কন্যাটিকে বিবাহ দেওয়া হয় নাই এমতাবস্থায় সদাশিব এক রাত্রিতে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া সেই কন্যাকে হরণ করিলেন এবং সেই কন্যার গর্ভ হইল। তখন কঞ্চৌফার জ্ঞাতি কুটুম্ব [illegible] কঞ্চৌফাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোর কন্যার গর্ভ কিরূপে হইল?" পরে সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল "এক রাত্রিতে একজন পুরুষ আসিয়া আমাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই।" তারপর সেই কন্যার পিতাকে সদাশিব বলিলেন "আমি সদাশিব, আমার বীর্য্যে এই গর্ভ হইয়াছে, তুমি ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই কন্যা হইতে এক পুত্র জন্মিবে এবং সে তোমাদের সকলের রাজা হইবে।" কালক্রমে সেই কন্যার এক পুত্র জন্মিল। কালের নিয়মে সেই বালক বড় হইল এবং মহাবলশালী হইল। পরে সে সমস্ত ত্রিপুরাগণকে তাহার অধীন করিয়া লইল। একদিন হরিণ শিকার করিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল যে পর্বতের একটি গহ্বর আলোকিত হইয়া আছে। সেই আলোক দেখিয়া কিসে ঐ আলো দিতেছে দেখিতে গেল।সেখানে গিয়া দেখিল যে একটা বেঙ একটা সাপকে ধরিয়াছে, সেই বেঙের মাথায় একটি মানিক্য আছে এবং সেই মাণিক্য হইতে আলো বাহির হইতেছে। তখন সেই সাপটাকে মারিল, পরে বেঙটাকে মারিয়া ঐ মাণিক্য লইয়া আসিল। সেই রাত্রিতে সদাসিব স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন, "এই মাণিক্য তুই গৌড়ের বাদশাকে দিবি, ইহাতে তোর সকল কার্যসিদ্ধ হইবে।" তখন সে ঐ মাণিক্য নিয়া গৌড়ের বাদশাকে দিল। গৌড়ের বাদশা ঐ মাণিক্য পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজ দণ্ড দিয়া তাঁহাকে রাজা করিয়া তাহার নাম রত্ন মাণিক্য রাখিলেন এবং বলিলেন " তোমার বংশে পরবর্ত্তী কালে যে সকল রাজা হইবে তাহাদের সকলের নাম মাণিক্য রাখিও।" তারপর বাদশা আদর করিয়া রত্ন মাণিক্যের সঙ্গে ছত্রিশ জাতির লোক দিয়া তাঁহাকে নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর রত্ন মাণিক্য রাজা নিজ দেশে আসিয়া নগর স্থাপন করিলেন এবং সেই নগরের নাম উদয়পুর রাখিলেন। তারপর রাজা সদাশিবের অনুগ্রহ স্বীকার করিয়া সোনার ত্রিশূল একটি

এবং অর্দ্ধচন্দ্র একটি মোটা দুইটি রাজচিহ্ন গড়াইলেন। রাজা বাহির হইলে এই দুইটি রাজার আগে আগে লইয়া যাওয়া হইত। রাজা বসিবার জন্য একটি সিংহাসন গড়াইয়া লইলেন। তারপর কিছুকাল স্বাধীন ভাবে রাজত্ব ভোগ করিলেন। কালক্রমে রত্ন মাণিক্য রাজা পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র অমর মাণিক্য। অমর মাণিক্যের পুত্র জছোমাণিক্য, জছোমাণিক্যের পুত্র বিজয় মাণিক্য এবং বিজয় মাণিক্যের পুত্র কৈলাণ মাণিক্য। কৈলাণ মাণিক্যের দুই পুত্র জন্মিল, একজনের নাম গোবিন্দ মাণিক্য এবং অপর জনের নাম ছত্র মাণিক্য। গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হইয়া তিন বৎসর রাজত্ব করিলে পর তাহার ভাই ছত্র মাণিক্য মুসলমান নবাবের নিকট গিয়া প্রতি বৎসর দুইটি হাতী দেওয়ার ও বাংলার নবাবের নিকট জামিনদার থাকিবার সর্তে রাজী হইয়া মুসলমান নবাব হইতে সৈন্যসামন্ত আনিয়া গোবিন্দ মাণিক্যকে সরাইয়া দিয়া নিজে রাজা হইলেন। সেই দিন হইতে রাজার নবাবকে হাতী দেওয়ার সর্ত হইল এবং রাজবংশের লোকের মুসলমানের নিকট জামিনদার থাকিবার চুক্তি হইল। তারপর গোবিন্দ মাণিক্য রাজা লুকাইয়া লুকাইয়া নিজ ঘরে দুইবৎসর রহিলেন। ছত্র মাণিক্য রাজা হওয়ার পর লোকের সুখ দুঃখের বিচার করিতেন না এবং গণ্যমান্য লোকদিগকে হতমান করিতেন। তখন সমস্ত বড়লোকগণ পরামর্শ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট গিয়া বলিলেন, "ছত্র মাণিক্য সমস্ত দেশ উচ্ছন্ন করিল। পূর্ব্বে কোনও দিন মুসলমান বাদশাকে হাতী দেওয়ার বা জামিনদার থাকিবার চুক্তি ছিল না। ছত্র মাণিক্য তাহাই করিল। তজ্জন্য আমরা সকলে একমত হইয়া আপনাকে রাজা করিব।" এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, তোমরা যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে রাজা কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে ভাল করিয়া সম্মান দিব।" তারপর ছত্র মাণিক্যকে বধ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হইলেন। গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হওয়ার কতকদিন পরে মুসলমান নবাবকে হাতী দেওয়া বন্ধ করিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য অনেক দিন রাজত্ব করার পর মারা গেলেন।

তারপর গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য রাজা হইলেন। রাম মাণিক্য রাজা তাহার ভাই নরেন্দ্র মাণিক্যকে প্রতিপালন করিয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। চম্পক রাই রাম মাণিক্য রাজার সম্পর্কে ছোট ভাই হইতেন। রাম মাণিক্য রাজা চম্পক রাইকে সকল গুণে যোগ্য দেখিয়া যুবরাজ করিলেন। পরে রাম মাণিক্য রাজার বিবাহিতা প্রধানা ভার্যার গর্ভে রত্ন মাণিক্য জন্ম গ্রহণ করেন এবং অবিবাহিতা তিন ভার্য্যার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল। একজনের নাম দুর্জয় সিংহ, একজনের নাম ঘনশ্যাম এবং অপর জনের নাম চন্দ্রমণি। এইরূপে রাম মাণিক্য রাজার চারি পুত্র জন্মিল। রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার সময়ে রত্ন মাণিক্যের বয়স মাত্র সাত বৎসর ছিল। রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার সময় যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হাতে তদীয় রাজ্য সহিতে রত্ন মাণিক্যকে সমর্পন করিলেন।

রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার পর যুবরাজ চম্পক রাই সাত বৎসরের বালক রত্ন মাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজা করিলেন। রাজ্যের যাবতীয় কাজ-কারবার সকলই চম্পক রাই নিজেই চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিল। তারপর রাম মাণিক্য রাজার ভাই নরেন্দ্র মাণিক্য

মুসলমান নবাবের নিকট গিয়া বাদশাকে আরও দুইটি হাতী বাড়াইয়া দেওয়ার সর্তে এবং [illegible] নবাবের জন্য একটি হাতী দেওয়ার অঙ্গীকারে নবাবের লোক-লস্কর আনিলেন। এই [illegible] চম্পক রাই পলাইয়া ঢাকায় গেলেন।

রত্ন মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য [illegible] মাণিক্যকে সঙ্গে রাখিয়া ভালরূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য [illegible] পূর্ব্বের পাত্র, মন্ত্রী সকলকে ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজার সুখ-দুঃখের বিষয়ে [illegible] যত্ন লইলেন না। তারপরে সকলে যুক্তি করিয়া চম্পক রাইয়ের নিকটে গোপনে পত্র [illegible] যে, "নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়া অন্যায় নিয়ম-কানুন চালু করিয়াছেন; প্রজার সুখ-দুঃখের [illegible] ভাবিয়া দেখেন না। এই কারণে দেশ উচ্ছন্নে যাইতেছে। আপনিও ঢাকাতে গিয়া [illegible] কাটাইতেছেন। অত্রাবস্থায় যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় রত্ন মাণিক্যকে রাজা করিয়া এবং আপনিও [illegible] পদে থাকিয়া প্রজা-পালন করিতে পারেন তাহার উপায় চিন্তা করিয়া শীঘ্র চলিয়া [illegible] আমরাও আপনার সঙ্গে আছি এইরূপ জানিবেন।" উক্তরূপে পত্র লিখিয়া তাহারা গোপনে [illegible] চম্পক রাইয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চম্পক রাই এই পত্র পাইয়া নবাবের লোক-লস্কর [illegible] দেশে আসিলেন। তখন নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা নিজ দেশের লোক-লস্কর লইয়া গিয়া [illegible] উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গের তালেবর লোকেরা নরেন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চম্পক রাইয়ের পক্ষে আসিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা [illegible] রাজধানীতে আসিলেন এবং নিজের স্ত্রী ও পরিজনকে ফেলিয়া এবং রত্ন মাণিক্যকে [illegible] করিয়া পলায়ন করিলেন।

—০—

দ্বাদশ অধ্যায়

যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হত্যা

তারপর চম্পক রাই দেশে আসিয়া রত্ন মাণিক্যকে রাজা করিলেন এবং নিজেও যুবরাজের পদে রহিলেন। পরে নরেন্দ্র মাণিক্যকে খুঁজিয়া আনিয়া বধ করিলেন। তারপর চম্পক রাই সকলকে উপযুক্ত রূপে সম্মান দিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ বিবেচনা করিয়া এবং অনেক সিপাহী সঙ্গে রাখিয়া রত্ন মাণিক্য রাজার সেবা করিয়া কিছু দিন কাটাইলেন। চম্পক রাইয়ের ভাগিনা কাশীরামকে চম্পক রাই হাতিখেদার কাজের জন্য সুবা নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বের নিয়মে রাজবংশীয় ভিন্ন অপর কেহ আরোয়ান লইতে পারিতেন না। চম্পক রাই কাশীরামকে আরোয়ান সঙ্গে লইবার অনুমতি দিলেন। ইহা বড়বড় লোকদের অসহ্য হইল। তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া রাজার অজ্ঞাতে রাজা ও চম্পক রাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য রাজাকে বলিলেন, "চম্পক রাই সমস্ত অধিকার করিয়াছে, আপনি কেবল নামে মাত্র রাজা। বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্বে কখনও যুবরাজের হাতে কাজ কারবার থাকিত না। মহারাজ পূর্ব্বে বালক ছিলেন সেজন্য সবকিছু যুবরাজকে করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে মহারাজ সব কিছুরই যোগ্য বটে। অত্রাবস্থায় রাজ্যের কাজকারবার মহারাজের হাতে আনা উচিত।" তাহারা এইরূপ বলিলে রাজা কহিলেন, "চম্পক রাই সব কিছুরই ভালরূপে বন্দোবস্ত করিতেছে; তোমরা কেন এরূপ বলিতেছ?" তারপর তাহারা বারবার ঐরূপ বলাতে রাজা বলিলেন, "তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা হয়ত ঠিক, কিন্তু চম্পক রাইয়ের হাতে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও লোক-লস্কর আছে, এমতাবস্থায় কি প্রকারে রাজ্যের কাজকারবার আমাদের এখানে আনা যায়?" তখন তাহারা বলিল, "মহারাজ আদেশ দিলে চম্পক রাই সমস্তই দিয়া দিবে।"

তারপর মহারাজ তাহাদের কথামত চম্পক রাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজ্যের যাবতীয় রাজকারবার আমার এখানে হইবে।" রাজার আদেশ শুনিয়া চম্পক রাই সকল বিষয়ই রাজার নিকট দিয়া দিলেন। তারপর চম্পক রাই সংশয়াপন্ন হইয়া রাজসভায় আসা বন্ধ করিলেন। রাজা চম্পক রাই কেন রাজদরবারে আসেন না তাহা জানিতে চাহিয়া চম্পক রাইয়ের নিকট লোক পাঠাইলেন। ইহাতে চম্পক রাই বলিলেন, "দুর্জন সকলে মহারাজের সঙ্গে আমার ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেজন্য দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া আমি সেখানে যাইতেছি না।" চম্পক রাই যে সন্দেহ বশতঃ

রাজার নিকটে আসেন না একথা অন্যান্যেরা উলটা করিয়া রাজাকে বুঝাইল। তাহারা বলিল "চম্পক রাই মহারাজার সঙ্গে লড়িতে চায় বলিয়া মনে হয়; এক্ষণে আমরা যদি পূর্ব্বেই তাহাকে আক্রমণ করি তবে কেমন হয়?" রাজার চিত্তে চম্পক রাইয়ের জন্য মায়া ছিল। তাহারা এইরূপ বলিলেও রাজা কিছুই বলিলেন না। চম্পক রাই এই কথা শুনিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন চম্পক রাইয়ের ভাগিনা কাশীরাম চম্পক রাইকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি সেখানে যাইও না, সেখানে গেলে বিপদ ঘটিবে।" ইহাতে চম্পক রাই উত্তর দিলেন, "আমি স্বপ্নেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, আমার কেন বিপদ হইবে।" তখন কাশীরাম বলিল, "তুমি অনিষ্ট আচরণ কর নাই সত্য এবং রাজারও তোমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল না, কিন্তু দুষ্টগণ রাজার নিকট কান-কথা বলিয়া রাজার মনে তোমার প্রতি শত্রুভাব সৃষ্টি করিয়াছে। এক্ষণে রাজা ঐ দুষ্টগণের কথা এড়াইতে না পারিয়া পাছে কিছু অনিষ্ট করে এজন্যই আমি তোমাকে বাধা দিলাম।"

তারপর চম্পক রাই নিজ দুর্গের ভিতরে সিপাহী চাকর লইয়া এবং বড় বড় কামান পাতিয়া সাবধানে রহিলেন। এইরূপে তিনদিন কাটিল। কাশীরাম ছিল সিপাহীদের সর্দ্দার, তার ভয়ে চম্পক রাইয়ের দুর্গের দিকে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তখন চম্পক রাই বলিলেন, "আমি এই রকম ভাবে বাস করিলে লোকে আমার দুর্ণাম করিয়া বলিবে যে আমি রাজার বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরিয়াছি, এখন আমরা পলায়ন করিয়া চল ঢাকায় যাই। যদি ভবিষ্যতে সুবিধা মনে করি তবে ফিরিয়া আসিব।" চম্পক রাই এইরূপ মনস্থ করিয়া কাশীরাম সহ সাতজন লোক লইয়া রাত্রিতে পলায়ন করিলেন।

চম্পক রাই পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া রাজা লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "চম্পক রাইকে তালাস করিয়া ধরিয়া আনিও কিন্তু তাহাকে বধ করিও না।" তারপর রাজার সেই লোকেরা খুঁজিয়া তিন দিনের পর চম্পক রাইয়ের নাগাল পাইল। তখন কাশীরাম সেই লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে দুইজনকে কাটিয়া ফেলিল। তখন চম্পক রাই, "ইহা উচিত হয় না" এই কথা বলিয়া কাশীরামকে জাপটাইয়া ধরিলেন। তখন রাজার লোকেরা কাশীরাম ও চম্পক রাইকে ধরিয়া ফেলিল। তারপর তাহারা কাশীরামকে বধ করিল এবং চম্পক রাইকে ধরিয়া লইয়া আসিল। রাজধানী হইতে একদিনের রাস্তা দূরে থাকিতে তাহারা রাজাকে খবর পাঠাইয়া দিল যে, "যুদ্ধ করিতে গিয়া কাশীরাম মারা গিয়াছে এবং চম্পক রাইকে ধরিয়া আনা হইয়াছে।" এই কথা ঐ লোকেরা আসিয়া প্রথমে বড় বড় লোকদের নিকট বলিল। তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া এই কথা রাজাকে জানাইল না। তাহারা নিজেরা বলাবলি করিল যে চম্পক রাইকে রাজার সম্মুখে আনিলে মারিতে পারা যাইবে না, অতএব তাহাকে রাস্তায়ই মারা হউক। এইরূপ স্থির করিয়া বড় বড় লোকেরা লোক পাঠাইয়া দিল এবং রাজধানীর অনুমান এক প্রহরের রাস্তা দূরে থাকিতেই চম্পক রাইকে বধ করাইল। রাজা চম্পক রাইকে মারা হইয়াছে শুনিয়া অনেক দুঃখ করিলেন।

সেই সময়ে চম্পক রাইয়ের পত্নীগণ সহমরণে যাইবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিলেন। রাজা চম্পক রাইয়ের মৃতদেহ আনাইলেন। মুক্তিঘাটে চিতা তৈয়ার করাইয়া সহগামী পত্নীদের [illegible] চম্পক রাইয়ের মৃতদেহ সৎকার করাইলেন। তারপর রাজা নিয়মমতে চম্পক রাইয়ের [illegible] শ্রাদ্ধ করাইলেন এবং গঙ্গা নদীতে অস্থি বিসর্জন ও গয়াতে পিণ্ড দেওয়াইলেন। সেই সময়ে চম্পক রাইয়ের আড়াই বৎসর বয়সের এক পুত্র ছিল; রাজা তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া [illegible]রূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। চম্পক রাইয়ের বাড়িতে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ছিল সবই আনাইয়া রাজা নিজ ভাণ্ডারে পৃথক পৃথক ভাবে হিসাব করিয়া রাখিলেন। তারপর রাজা [illegible]দের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার বৈমাত্র ভাই দুর্জয় সিংহকে যুবরাজ করিলেন। সেই সময়ে রাজার অপর বৈমাত্র ভাই ঘনশ্যাম নবাবের নিকট জামিনে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা তাহাকে আনাইয়া বড় ঠাকুরের পদ দিলেন। রাজার অপর বৈমাত্র ভাই চন্দ্রমণিকে নবাবের কাছে জামিনদার থাকিতে পাঠাইলেন। ত্রিপুরা হইতে যে কেহ এইরূপ জামিনদার থাকিতে যাইত তাহার সঙ্গে [illegible] নিশান এবং ৬০ জন লোক দেওয়া হইত। টাকা-কড়ি বেশি করিয়া দিয়া সম্মান করিয়া তাহাকে মুসলমানের রাজ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হইত এবং তজ্জন্য বাংলা দেশের লোকেরা ত্রিপুরার জামিনদারগণকে আদর করিত। এইরূপে চম্পক রাই মারা যাওয়ার পর হইতেই রাজা রত্ন মাণিক্য [illegible] বিষয়েরই নিয়ম করিয়া দিয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

—০—

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজার দৈনিক কাজ

রাজা প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া করার পর দন্ত ধাবন করেন। তারপরে মালিশ [illegible] শরীরে তৈল মালিশ করিলে রাজা নদীর জলে স্নান করিয়া সোনার ঘটিতে করিয়া [illegible] গঙ্গাজল মাথায় ঢালেন। রাজার আদেশের বলে এই গঙ্গাজল মাসে একবার নৌকায় করিয়া [illegible] হইত। তারপর রাজা মন্দিরে গিয়া ইষ্ট-দেবতার সেবা-পূজা করেন। সেখান হইতে আসিয়া [illegible] করিয়া পুরাণপাঠ শুনেন। তারপরে ভোজন করিয়া বসন পরিধান করেন। সেই সময় [illegible] সেবক ডাকিয়া বলে—"মহারাজের বাহির হইবার সময় হইল।" সঙ্গে সঙ্গে সেলাম [illegible] তখন যুবরাজ ইত্যাদি বড় বড় লোকেরা দরবারে উপস্থিত হন। রাজ সভাপণ্ডিত ইত্যাদি [illegible] লোকেরাও আসে। তারপর দেড় প্রহর অতিক্রান্ত হইলে রাজা আসিয়া সেই সিংহাসন-ঘরে [illegible] হাসনের উপরে বসেন। যুবরাজ সেই সিংহাসন-ঘরে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করেন। সেই [illegible] গালিচার উপরে একটি সুজনী পাতা থাকে যুবরাজ আসিয়া তাহাতে বসেন। বড়ঠাকুরের [illegible] গালিচার উপরে একখণ্ড কাপড় পাতা থাকে, বড়ঠাকুর আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া [illegible] বসেন। দুইজন সভাপণ্ডিত আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এইরূপে বসেন। রাজ পুরোহিত [illegible] আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গালিচার উপরে বসেন। উজীর, নাজীর, নেমুজীর, [illegible] কতোয়াল মুছিব ও দেওয়ান আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকেন। [illegible] ঘরের দিকে আসিবার সময় উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহই অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইতে পারেন না।

দেশের অন্যান্য বড়লোকেরা তাহাদের লোকজন লইয়া এবং বাংলাদেশ হইতে [illegible] যাহারা চাকুরী করিতেছে তাহারা রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের সম্মুখের খোলা জায়গায় [illegible] থাকে। সেই খোলা জায়গায় সোনার লাঠি লইয়া দুইজন এবং রূপার লাঠি লইয়া দুইজন—[illegible] চারিজন লোক দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদিগকে গুরু-জবর্দ্দার বলে। দেশ বিদেশের লোক [illegible] প্রণাম করিতে আসিলে তাহাও গুরু-জবর্দ্দারদের রাজার কর্ণগোচর করিতে হয়। রাজা [illegible] দুই দণ্ডকাল বসিয়া থাকেন। যে সমস্ত বিষয়ে আলাপ করিবার থাকে তাহা এই সময় [illegible] তারপর একজন সেবক রাজবাড়ির ভিতর হইতে ফুল-চন্দন, সুগন্ধযুক্ত পান ও সুপারি [illegible]

দেয়। একজন ব্রাহ্মণ, যুবরাজ প্রভৃতি সকলকে নিয়মিত রূপে পান-সুপারি ইত্যাদি বিতরণ করে। তারপর সকলে এই ঘর হইতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখের খোলা জায়গায় রাজাকে প্রণাম করে। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে। তারপর রাজা উঠিয়া রাজবাড়ির ভিতরে যান এবং অন্যান্যেরা নিজ নিজ বাড়িতে যায়। পালাক্রমে একজন বড়ুয়া সোনার দুয়ারী ঘরে এবং একজন হাজারি অনুমান ৪০ জন লোক লইয়া রূপার দুয়ারী ঘরে থাকে। তাহারা রাত্রিতেও এই নিয়মে পাহারা দেয়। উপরোক্ত নিয়মে প্রতিদিন কার্য্য চলে।

—০—

চতুর্দশ অধ্যায়

নিজে রাজা হওয়ার জন্য ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের প্রচার ও ষড়যন্ত্র

এইরূপে রত্ন মাণিক্য রাজা নিজ ধর্ম্মানুসারে কিছুকাল প্রজা পালন করিতে লাগিলেন, প্রজাগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। একদা কবিশেখর নামে এক কায়েস্থের ভগিনীকে রাজা রত্ন মাণিক্য রাণী করিয়া আনিলেন। রাজা এই মহিলার মায়ায় কবিশেখরকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে ঘন ঘন পুরস্কার আদি দিতে লাগিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিতে লাগিলেন যে রাজার ভাণ্ডারের সমস্ত কিছুই কবিশেখর নারায়ণ নিয়া শেষ করিল। কবিশেখর রাজার আদরে গর্ব্বিত হইয়া একদিন রাজার ভাই ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে "বান্দীর পুত" বলিয়া গালাগালি দিলেন।

বড়ঠাকুর এই কথা শুনিয়া দুই দিন পরে রাজবাড়িতে গিয়া দুয়ারীকে (স্ত্রীলোক [illegible]) এই বলিয়া রাজাকে জানাইয়া পাঠাইলেন যে "আমি রাম মাণিক্য রাজার পুত্র এবং রত্ন মাণিক্য রাজার ভাই। কবিশেখর আমাকে 'বান্দীর পুত' বলিয়াছে। তুমি এই কথা গিয়া রাজাকে জানাও [illegible] আমি কবিশেখরকে কাটিতে যাইতেছি।" দুয়ারী রাজার সেবকের মারফতে এই কথা রাজাকে জানাইলে রত্ন মাণিক্য লোক পাঠাইয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন যে "কবিশেখর এইরূপ বলিতে পারে না, আমি তাহাকে শাস্তি দিব, তোমরা গিয়া বড়ঠাকুরকে অপেক্ষা করিতে বল।" [illegible] লোকেরা আসিয়া দেখে যে বড়ঠাকুর চলিয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর দুয়ারীকে খবর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া কবিশেখরের বাড়িতে গেলেন। কবিশেখর নিজ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পূজা করিতে ছিলেন। সেই সময় ঘনশ্যাম চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে ঢুকিয়া কবিশেখরকে কাটিয়া ফেলিলেন। রাজা তাড়াতাড়ি করিয়া ঘনশ্যামের পিছনে পিছনে লোক পাঠাইয়া দিলেন। বড়ঠাকুর কবিশেখরকে কাটিয়া নিজের বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহারা তাহার দেখা পাইল।

তারপর কবিশেখর নারায়ণের ভাইয়ের বংশীয়েরা তাহার মৃতদেহ রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া রাজার নিকট নালিশ করিয়া বলিল যে, বিনা অপরাধে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর কবিশেখরকে হত্যা করিয়াছে। রাজার স্ত্রী কবিশেখর নারায়ণের ভগিনীও অনেক কাঁদিয়া রাজাকে বলিল, "তুমি বিদ্যমান থাকিতে বিনা দোষে বড়ঠাকুর আমার ভাইকে কেমনে বধ করেন?" তখন রাজা বলিলেন

ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর আমার ভাই হয়, তাহাকে কেন কবিশেখর অন্যায় কথা বলিল? এই কাজের জন্য বড়ঠাকুরকে শাস্তি দিলেও দিতে পারি কিন্তু তাহা করিলে লোক-সমাজে আমার দুর্নাম হইবে, আমরাও তোমার ভাইকেও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।" এই কথা বলিয়া রাজা নিজের স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বড়ঠাকুর রাজার স্ত্রীর ভাই কবিশেখরকে রাগ করিয়া মনে মনে রাজা প্রতি সংশয়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

রত্ন মাণিক্য রাজার এক সহোদরা ভগ্নী ছিলেন; তাহাকে রাজা রাজদুর্লভ নামক এক ত্রিপুরার তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে রাজা ঐ ভগ্নীর প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া রাজদুর্লভ নারায়ণকে জেনারাল মুছিবের পদ দিলেন এবং তাহাকে আরোয়ান ও নিশান দিলেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রাজার এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "কোনও দিনও কোনও রাজা কোতোয়াল মুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দেন নাই, রত্ন মাণিক্য রাজা এইরূপ অনিয়মের কাজ করিতেছে।" এই কথা ঘনশ্যাম মনে করিয়া রাখিলেন। এদিকে রত্ন মাণিক্য রাজা কোনও কথা মনে করিয়া রাখিলেন না এবং ঘনশ্যামকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহমমতা করিতে লাগিলেন।

মুরাদ্‌বেগ নামে এক মোগল ছিল। মুরাদ্‌বেগের পিতাকে দিয়া চট্টগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আনা হইয়াছিল এবং তাহাকে অত্যন্ত উপযুক্ত দেখিয়া রাজা সম্মান দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। মুরাদ্‌বেগের পিতা মারা যাওয়ার পর রত্ন মাণিক্য রাজাও পূর্ব্বের ন্যায় মুরাদ্‌বেগকেও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে রাখিলেন। মুরাদ্‌বেগ কর্মী হিসাবে চাকরি লইয়া রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তাহার ঘর-বাড়ি মেহেরকুল পরগনায়, পরিজনবর্গ সেখানেই থাকে। তাহাছাড়া রাজার আবশ্যক মতে কাজ-কর্ম্ম করিতে ঢাকাতেও আসাযাওয়া করে; সে জন্য মুরাদ্‌বেগ ঢাকাতেও একটি বাড়ি করিয়াছে।

মুরাদ্‌বেগের এক ভগ্নী মেহেরকুল পরগনার বাড়ীতে থাকে। সুন্দরী কন্যা আছে শুনিয়া রাজা মুরাদ্‌বেগকে না জানাইয়া সেই কন্যা আনিবার জন্য গোপনে একজন সেবক পাঠাইয়া দিলেন। সেবক ঐ কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ জানাইল এবং বলিল, "তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য মহারাজের আদেশ হইয়াছে, তোমাকে যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা বলিল, "ভাল হইয়াছে, মহারাজ যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমি যাইব। তুমি দুই ঘড়ি অপেক্ষা কর; আমি জিনিসপত্র কিছু গুছাইয়া লই।" এইরূপে তাহাকে অপেক্ষা করিতে রাখিয়া গোপনে মুরাগ্‌বেগের নিকট খবর পাঠাইয়া জানাইল যে "আমাকে পূর্ব্বে ঢাকার এক মোগলের নিকট বিবাহ দিয়াছ; এদিকে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজার একজন সেবক আসিয়াছে। রাজা যদি আমাকে লইয়া যায় তবে ঐ মোগলের নিকট তোমার অপযশ হইবে। এই বিষয় জানিয়া যাহা উচিত মনে হয় কর।"

মুরাদ্‌বেগ এই পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়া গোপনে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট সমস্ত কথা জানাইল। এই কথা শুনিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মনে মনে ভাবিলেন, এই সুযোগে আমি মুরাদ্‌বেগের সঙ্গে রাজার বিবাদ ঘটাইব এবং ইহাতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এইরূপ স্থির

করিয়া মুরাদ্‌বেগকে বলিলেন, "রাজার সঙ্গে কি তোমার পূর্বে এবিষয়ে কোন কথাবার্তা হইয়াছে? এখন তুমি ভাবিয়া দেখ যে রাজার এই কাজ তুমি ভাল মনে কর কি না?" মুরাদ্‌বেগ বলিল, "এ বিষয়ে রাজার সঙ্গে আমার পূর্বে কোনও কথাবার্তা হয় নাই, আমি ইহার কিছুই জানি না। তাহা ছাড়া পূর্বেই এই কন্যা আমি ঢাকায় এক মোগলের নিকট বিবাহ দিয়াছি, এখন রাজা যদি এই কন্যা লইয়া আসেন তবে আমি ঐ মোগলের নিকট কি উত্তর দিব? আর সেই মোগলই বা কেন আমাকে ছাড়িয়া দিবে? তাহা ছাড়া পূর্ব্ব অবধি আমাদের মেয়ে রাজারা কখনও নেন নাই। বর্ত্তমানে রাজা এইরূপ অনিয়মে চলিলে আমি কি বলিব! আর কিরূপেই বা এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইব?" মুরাদ্‌বেগের উত্তর আশাজনক দেখিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছ, ভালই বলিয়াছ। যদি তুমি তোমার ভগ্নীকে রাখিতে ইচ্ছা কর তবে এখনই তোমার মেহেরকুলের বাড়ীতে গিয়া তোমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের লোকজন লইয়া ঢাকায় চলিয়া যাও, তবে তোমার সবদিক্ রক্ষা হইবে।" তখন মুরাদ্‌বেগ ঢাকায় চলিয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়া ঘনশ্যাম ঠাকুরকে বলিল, "আমার ছাড়পত্র নাই, চণ্ডীগড়ের সিপাহীরা আমাকে কেন ছাড়িয়া দিবে?" ঘনশ্যাম বলিলেন, "তোমাকে কে আটকাইতে পারে? তুমি নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া চলিয়া যাইও।" তারপর মুরাদ্‌বেগ নৌকা লইয়া রাজধানী হইতে মেহেরকুলের দিকে রওনা হইল।

মুরাদ্‌বেগের চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া রাজা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি নিজে গিয়া মুরাদ্‌বেগকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আইস।" এই কথা বলিয়া রাজা তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ঘনশ্যামের মনে যে নিজে রাজা হওয়ার দুরাশা আছে তাহা রাজা জানিতেন না। তখন ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, 'উত্তম, আমি মুরাদ্‌বেগকে ফিরাইয়া আনিব, মহারাজ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইবেন না।" রাজার নিকটে এই কথা বলিয়া ঘনশ্যাম মুরাদ্‌বেগকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। ঘনশ্যাম যাইয়া চন্ডীনগরের উজানে মুরাদবেগের লাগ পাইলেন। তখন ঘনশ্যাম বলিলেন, "তোমাকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য রাজা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; তোমার আমার মধ্যে যে গোপন কথা হইয়াছে রাজা তাহার কিছুই জানেন না। এখন আমার মনের কথা তোমাকে এবং তোমার মনের কথা আমাকে বলা দরকার। তাছাড়া আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ হয় সে বিষয়েও ব্যবস্থা করা উচিত।" তখন মুরাদবেগ বলিল, "সাহেব যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।" তখন তামা-তুলসী সম্মুখে রাখিয়া শপথ করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন, "আমি তোমাকে ছাড়িব না এবং তুমিও আমাকে ছাড়িতে পারিবেনা। যদি আমাদের এই শপথ ভঙ্গ হয় তবে খোদা ও পরমেশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবেন।" এইরূপে স্বীকৃত হইয়া উভয়ে শপথ গ্রহণ করিল। তখন ঘনশ্যাম মুরাদবেগকে বলিলেন, "আমাদের রাজা কতোয়ালমুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দিয়াছেন। তাহাছাড়া কবিশেখরকে দেওয়ান করিয়া বড় করিয়া দিয়াছিলেন, কবিশেখর আমাদের কাহাকেও মান্য করিতেন না। এখন আবার তোমার পরিবারের উপর অন্যায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইরূপ অনিয়ম কে সহ্য করে? তুমি আমার সহায় হও, আমি রাজা

স্ত্রী।" মুরাদ্‌বেগ বলিল "ভালই হইয়াছে, আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। আপনার জন্য আমার দেহ ও প্রাণ দিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব।" ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, "তুমি আর বিলম্ব করিও না। তোমার স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনদের লইয়া শীঘ্র ঢাকাতে চলিয়া যাও। রাজা তোমাকে পাইলে মারিয়া ফেলিবে। তুমি ঢাকায় গিয়া সিপাহী ও চাকর যাহা পার সংগ্রহ করিয়া রাখ। আমি এখান হইতে হাতী ধরিবার জন্য যাইব। সেই সময়ে আগের দিনের নিয়মের চেয়ে দেশের লোকজন বেশি করিয়া আমার সঙ্গে লইয়া আসিব। পরে তোমার নিকট আমি লোক পাঠাইয়া দিব। তখন তুমি সিপাহী ও চাকর লইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইও। এখন তুমি চলিয়া যাও, আমি গিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তোমার দেখা পাইলাম না বলিয়া আমি রাজার নিকট বলিব।" তখন মুরাদ্‌বেগ বলিল, "রাজার একজন সেবক আমার বাড়িতে গিয়াছে; তাহার কি ব্যবস্থা করিব?" ঘনশ্যাম বলিলেন, তুমি তাহাকে কাটিয়া ফেলিও।" মুরাদ্‌বেগ বলিল, " তাহা হইলে আপনার একজন লোক আমার সঙ্গে দিন।" তখন ঘনশ্যাম নিজের একজন বিশ্বাসী লোক মুরাদ্‌বেগের সঙ্গে দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। মুরাদ্‌বেগ সহর মেহেরকুলের বাড়িতে গিয়া রাজার সেবকটিকে কাটিয়া ফেলিল এবং পরিবারবর্গ লইয়া নৌকায় উঠিয়া ঢাকায় চলিয়া গেল। রাজার সেবককে কাটিবার জন্য ঘনশ্যাম ঠাকুর যে লোক দিয়াছিলেন মুরাদ্‌বেগ তাহাকেও সঙ্গে করিয়া ঢাকায় লইয়া গেল।

ঘনশ্যাম এইরূপে মুরাদ্‌বেগকে পাঠাইয়া দিয়া নিজের সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, "মুরাদ্‌বেগের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা কেহ বলিও না। যাহার মুখে এই কথা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি কাটিয়া ফেলিব।" তারপর ঘনশ্যাম রাজধানীতে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "আমি মুরাদ্‌বেগের নাগাল পাইলাম না। সে পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। গিয়াই বা সে আমাদের কি করিতে পারে! কোনও অসুবিধার জন্য বোধ হয় সে চলিয়া গিয়াছে। পুনর্বার আমি তাহাকে আনাইলে সে আসিবে। বিশেষতঃ সে আমাদের কিছুই করিতে পারে না।" এইরূপে রাজাকে ছলনা করিয়া প্রবোধ দিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর নিজ বাড়িতে চলিয়া আসিলেন। ঘনশ্যামের দুরভিসন্ধির কথা রাজা জানিতে পারিলেন না।

—০—

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাত্রা

এইরূপে কিছুদিন কাটিল। তাহাদের দেশে প্রতি বৎসর হাতী ধরিবার জন্য বড়ঠাকুরকে যাইতে হয়, তখন বড়ঠাকুরের সঙ্গে অনেক লোক যায়। হাতী-ধরার জায়গায় তিন চারি মাস থাকিয়া একশত বা আশিটি হাতী যাহা পাওয়া যায় ধরিয়া আনে। এই হাতীর মধ্যে কিছু নবাবকে ইরশাল দেয় এবং কিছু বিক্রয়ও করে। তাহাছাড়া দেশ বিদেশেও দেওয়া হইত এবং কিছু অবশিষ্টও থাকিত।

তারপর হাতী ধরার নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাওয়ার সময় আসিয়াছে। দিন-তারিখ দেখিয়া বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাইতে প্রস্তুত হউক এবং সঙ্গে যে যে লোক নিতে হইবে তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য খবর দিক।" তখন রাজার আদেশ শুনিয়া ঘনশ্যান বড়ঠাকুর বলিলেন, "মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে তখন আমি হাতী ধরিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইব। কিন্তু পূর্ব্বে মুসলমান নবাবকে দুইটি হাতী দেওয়ার সর্ত ছিল; তারপর নরেন্দ্র মাণিক্য আরও দুইটি বাড়াইয়া দিলেন। চম্পক রাই অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া ঐ বর্ধিত হাতীগুলি দেন নাই। বর্ত্তমানে ঐ বাকীপড়া হাতীর জন্য মুসলমান নবাব বার বার মহারাজকে জানাইয়া পাঠাইয়াছে। যদি এড়াইতে না পারা যায় তবে সেই হাতীও দিতে হইবে। এই কারণে এ বৎসর বেশি করিয়া হাতীধরা দরকার এবং সেজন্য বেশি করিয়া লোকও লইয়া যাইতে হইবে।" ঘনশ্যাম এইরূপ বলিলে পর রাজা বলিলেন, "বড়ঠাকুর ভালই বলিয়াছে, পূর্বের চেয়ে অতিরিক্ত যতলোক লাগিবে বড়ঠাকুর সংগ্রহ করিয়া লইয়া পরে আমাকে জানাইবে।" তারপর ঘনশ্যাম অন্যবারের চেয়ে বেশি করিয়া বড়লোক ও অন্যান্য লোক যাহা আবশ্যক মনে করিলেন সঙ্গে করিয়া লইলেন এবং পরে রাজাকে গিয়া অতিরিক্ত লোক যাহা লওয়া হইয়াছে জানাইলেন। রাজা তাহার কার্য্য অনুমোদন করিয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন। বড়ঠাকুর রত্ন মাণিক্য রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই সমস্ত লোকজন সঙ্গে করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে হাতী ধরিতে রওনা হইয়া খণ্ডল পরগণায় গিয়া বাসা করিয়া রহিলেন।

—০—

ষোড়শ অধ্যায়

ত্রিপুরার দরবারে আসামের দূত

এদিকে স্বর্গদেবতার আদেশে আমরা দূতগণ চৈত্র মাসে ত্রিপুরার রাজধানীতে পৌঁছিলাম। রাজা রত্ন মাণিক্য আমাদের জন্য থাকা ও খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আমাদিগকে রাখিলেন। পরে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আজ চারি মাস হয় বড়ঠাকুর হাতী ধরিতে গিয়াছে। এই কার্য্যে লোকজন ও দেশের বড় লোকেরা বেশী করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদের এখানে স্বর্গদেব রাজার দূত আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদিগকে রাজসভায় অভ্যর্থনা করা দরকার। বড় রাজার নিকট হইতে দূত আসিয়াছে, অতএব বৃহৎ সভা করিয়া সেই দূতগণকে দরবারে অভ্যর্থনা করা উচিত। এই কথা জানিয়া বড়ঠাকুর সত্বর চলিয়া আসুক।" রাজার এই পত্র পাইয়া বড়ঠাকুর রাজার নিকট ছল করিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে তিনি বলিলেন, "মহারাজ উত্তম আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বহুদিনের চেষ্টায় হাতী ধরা হইয়াছে, আর কিছু ধরিবার বাকী আছে, ঐগুলি না ধরা উচিত হয় না। রাজধানীতে দেশের লোকজন জড় করিয়া সুন্দররূপে দরবার করিয়া স্বর্গ রাজার দূতগণকে দরবারে অভ্যর্থনা করা হউক। পরে তাহাদিগকে বিদায় দিবার সময়ে মহারাজা আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে হয় সেরূপ করিবেন।" রাজা এই পত্র পাইয়া ঘনশ্যাম আসিবে না জানিয়া আমাদিগকে রাজসভায় অভ্যর্থনা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

রত্ন মাণিক্য রাজা যুবরাজ ও উজীরকে আদেশ করিলেন, "বড় রাজার দূত আসিয়াছে, তাহাদিগকে দরবারে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দিন তারিখ দেখিয়া রাজধানীর লোকজন জড় করিয়া জিনিসপত্র সুন্দররূপে গুছাইয়া ভাল করিয়া দরবারের ব্যবস্থা করুক।" যুবরাজ ও উজীর রাজার আদেশ শুনিয়া দিন তারিখ দেখিয়া বৈশাখ মাসের চার দিন গত হইলে আমাদিগকে দরবারে উপস্থিত করার দিন স্থির করিলেন। দরবারের দিন অনুমান ষাট জন ঘোড়সওয়ার দরবারে আসিল। ইহারা বিদেশ হইতে আসিয়া এরাজ্যে চাকরিতে ভরতি হইয়াছে। ইহাদের পরনে ছিল জামা, ইজার এবং জামিয়ার এবং ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল, তরোয়াল, তীর এবং ধনুক; তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হাতে বড়শিও ছিল। তাহাদের ঘোড়াগুলির জিন কতক ছিল চামড়ার আর

কতক ছিল বনাতের। তাহারা মাসিক হিসাবে রুপার ঠাকায় মাহিয়ানা পায়। ঢালীর সংখ্যা অনুমান এক হাজারের মতন হইবে। ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল এবং তরোয়াল। তীরন্দাজ ছিল অনুমান দেড় হাজার; ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল, তীর এবং ধনুক। হিন্দুস্থানী সৈন্যের সংখ্যা অনুমান পাঁচশত; ইহাদের অস্ত্র ছিল বন্দুক, ঢাল এবং তরোয়াল। এই সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে জমাদার ও হাজারি এই দুই পদের লোক আছে। তাহাদের মাসিক বেতনের টাকা এই দুই পদের লোকদের হাতে দেওয়া হয়; তাহারা অন্যান্যদের ঐ টাকা বাঁটিয়া দেয়। আমরা ত্রিপুরা রাজার সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত লোকের সংখ্যা তিন হাজারের মতন হইয়াছিল।

আমাদের দুই জনকে নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার দুইজন দূত রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও উদয় নারায়ণ বিশ্বাস ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের এখানে আসিলেন। আমাদের জন্যও দুইটি ঘোড়া আনা হইল। ত্রিপুরার এই দুইজন দূতের সঙ্গে তীর-ধনুক-ধারী অনুমান চল্লিশ জন লোক আসিল। তাহারা আমাদের দুইজনকে আমাদের বাসা হইতে আনিয়া গড়ের বাহিরে রুপার দুয়ারী ঘরের সম্মুখে একটি কুঁজী ঘরে বসাইলেন। সেখানে রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার আমাদের সঙ্গে রহিলেন আর উদয় নারায়ণ রাজার কাছে চলিয়া আসিলেন।

তখন যুবরাজ দরবারে আসিলেন। তাহার সঙ্গে আসিল লাল নিশান আটটি, ঘোড়সওয়ার ছয় জন, হিন্দুস্থানী সৈন্য, ঢালী, তীরন্দাজ ইত্যাদি লোক অনুমান এক শ জন। যুবরাজ পালকিতে চড়িয়া দরবারে আসিলেন। ঐ পালকির চাল ছিল বনাত দিয়া ঢাকা। সেই চালের দুই মাথায় দুইটি রুপার কলাফুল দেওয়া ছিল। পালকির গা বনাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া ছিল এবং উহার দুই মাথায় রুপা দিয়া বাঘের মুখ বানাইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুবরাজের পরনে ছিল কিংখাবের জামা, সোনালী পটুকা, সোনালী কাজকরা গুজরাটী জিরা, এলাছার ইজার, ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়, কানে মুক্তা, গলায় দুগ্‌দুগীর সহিত মুক্তার মালা এবং কোমরে পাথর-খচিত হাতলযুক্ত একখানি খঞ্জর। তাহার দুই দিকে দুই জন সেবক সোনার হাতলযুক্ত দুইখানি তলোয়ার এবং সোনার চোখ লাগান ঢাল দুইটি লইয়া আসিতেছিল। তাহার আগে আগে আসিতেছিল দশটি হাতী, তার মধ্যে দুইটির উপরে বনাত দেওয়া ছিল। হাতীগুলির দাঁতে সোনার বলয় ছয় জোড়া করিয়া দিয়াছিল। উহাদের কপালে সোনার গোলাকৃতি গহনা পরানো ছিল। এই সমস্ত ছাড়া যুবরাজের চড়িবার তুর্কী ঘোড়া ছিল একটি; উহার জিন ছিল বনাতের তৈরী এবং মুখছাউনিটি ছিল সোনালী রংয়ের। চামড়ার তৈরী জিন লাগান টাঙ্গন ঘোড়া ছিল বারটি। এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম লইয়া যুবরাজ আসিলেন। এই সময়ে একজন লোক যুবরাজকে চামড় ঢুলাইতেছিল এবং অপর একজন যুবরাজের উপরে আরোয়ান ধরিয়া রাখিতেছিল। তারপর আসিলেন রাজবংশীয় ধরণীধর ঠাকুর। তাহার সঙ্গে ছিল সবুজ রংয়ের নিশান দুইটি, হাতী দুইটি, চামড়ার জিন লাগান ঘোড়া তিনটি এবং বনাতের তৈরী জিন লাগান ঘোড়া একটি। ঢালী ও হিন্দুস্থানী সৈন্য সহ তাহার সঙ্গে চল্লিশ জন লোক ছিল। ধরণীধর ঠাকুরও আসিলেন বনাতের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া।

তাহার পরনে ছিল মখমলের জামা, গুজরাটী সোনালী কাজকরা জিরা, সোনালী পটুকা, আতলঞ্চের ইজার এবং একখানা শাল কাপড়। তাহার কানে মুক্তা, গলায় দুগ্‌দুগীর সঙ্গে মুক্তার মালা এবং কোমরে সোনালী রংয়ের জামিয়ার ছিল। সোনার গিলটি করা তলোয়ার একটি এবং ঢাল একটি সেবকের হাতে ছিল। তাহাদের দেশে রাজবংশীয় লোকদিগকে ঠাকুর বলে।

তারপর উজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে হাতী ছিল ছয়টি, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া পাঁচটি; ঘোড়সওয়ার তিন জন এবং ঢালী, হিন্দুস্থানী ও তীরন্দাজ সৈন্য মিলিয়া প্রায় আশি জন লোক তাহার সঙ্গে আসিল। বনাতের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া উজীর আসিলেন। সেই পালকির দণ্ডটি ছিল মখমল দিয়া মোড়ান। উজীরের পরনে ছিল খাছার জামা, সোনালী পটুকা, জিরা, গোছপেছ, আতলঞ্চের ইজার, সাল কাপড় একখানা এবং কোমরে সোনালী রংয়ের জামিয়ার। তিনি কানে মুক্তা এবং গলায় দুগ্‌দুগীর সঙ্গে মুক্তার মালা পরিধান করিয়াছিলেন। পালকির দুই ধারে দুই জন সেবক লইয়া চলিয়াছিল ঢাল দুইটি এবং সোনার হাতলযুক্ত ও বনাতের তৈরী খাপের মধ্যে তলোয়ার দুইটি। এইরূপে সাজিয়া উজীর দরবারে আসিলেন।

তারপর নজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী দুইটি, ঘোরসওয়ার দুইজন, ঢাল-তরোয়াল ধারী সৈন্য অনুমান ষাট জন, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি ও চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি ছিল। নাজীর মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া আসিলেন। তিনি পরিয়াছিলেন ছহানরের জামা, গুজরাটী সোনালী রংয়ের পটুকা, সোনালী কাজকরা জিরা, রুপালী গোছপেছ, আতলঞ্চের ইজার, শাল কাপড়, কোমরে সোনালী কাজকরা জামিয়ার, কানে মুক্তা ও গলায় দুগ্‌দুগী। দুইজন সেবক দুই দিকে দুইখানা ঢাল ও দুইটি তরোয়াল লইয়া আসিতেছিল। এইরূপে নাজীর দরবারে উপস্থিত হইলেন।

তারপর কার্কোন আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী দুইটি, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া চারিটি, ঘোর-সওয়ার দুইজন এবং ঢাল-তরোয়াল ও বন্দুকধারী সৈন্য প্রায় ষাট জন। তাহার পরনে ছিল বন্দরী ছিটের জামা, বুটিদার জিরা, রুপালী গোছপেছ, সোনালী পটুকা, আতলঞ্চের ইজার, কানে মুক্তা ও সোনালী কাজকরা জামিয়ার। সঙ্গে একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া একজন সেবক আসিতেছিল।

পরে আসিলেন কোতোয়াল-মুছিব। তাহার সঙ্গে আসিল জরদ রংয়ের নিশান সাতটি এবং হাতী আটটি। হাতীগুলির মধ্যে দুইটির উপরে বনাত দিয়া ঢাকনি দেওয়া হইয়াছে ও উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহনা দেওয়া হইয়াছে। বনাতের জিন ও সোনালী রংয়ের মুখ-ছাউনি দেওয়া ঘোড়া দুইটি এবং চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া আটটি, ঘোর-সওয়ার ছয়জন, ঢালী অনুমান চল্লিশ জন, বর্কন্দাজ প্রায় ত্রিশ জন এবং তীরন্দাজ অনুমান চল্লিশ জন তাহার সঙ্গে আসিল। তিনি পালকিতে চড়িয়া আসিলেন। ঐ পালকির উপরে বনাত দিয়া ছাউনি দেওয়া ছিল; ছাউনির উপরে

দুই মাথায় রুপার দুইটি কলাফুল বসান ছিল; পালকির বেড়া বনাত দিয়া মোড়া ছিল [illegible] দরজায় রুপার তৈরী মকরের মুখ আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোতোয়াল-মুছিবের [illegible] সোনালী রংয়ের বাদামী কাপড়ের জামা, সোনালী গুজরাটী জিরা, গোছপেছ, সোনালী [illegible] গুজরাটী আতলঞ্চের ইজার। সোনালী রংয়ের একখানি তসর দেড়ভাঁজ করিয়া [illegible] লইয়াছিলেন। পাগড়ির উপরে সোনার তরোয়াল দুইটি, কানে মুক্তা, গলায় পাথর খচিত [illegible] দুগ্‌দুগীর সহিত মুক্তার মালা এবং কোমরে সোনার হাতলের উপরে পাথর খচিত [illegible] পরিধান করিয়াছিলেন। পালকির দুই দিকে সেবকেরা সোনার মুষ্ঠিযুক্ত তরোয়াল দুইটি, [illegible] চোখ দেওয়া ঢাল দুইটি, এবং সোনালী রং করা বড়শি দুই গাছ লইয়াছিল। ঐরূপে [illegible] কোতোয়াল মুছিব দরবারে আসিলেন।

তারপরে দেওয়ান আসিলেন। তাহার সঙ্গে হাতী দুইটি, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া [illegible] চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি এবং ঢাল-তরোয়াল-ধারী লোক অনুমান চল্লিশ জন [illegible] তাহার পরনে ছিল চিকণ কাপড়ের জামা, সোনালী কাজকরা জিরা, রুপালী গোছপেছ [illegible] পটুকা, আতলঞ্চের ইজার এবং শাল কাপড় একখানা। তিনি কানে মুক্তা ও গলায় সোনা [illegible] রুদ্রাক্ষের মালা দুই লহর পরিয়াছিলেন এবং একটি সোনালী জামিয়ার সঙ্গে লইয়াছিলেন। [illegible] সাজিয়া মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া দেওঁয়ান আসিলেন।

ইতঃপূর্বে চন্দ্রমণি ঠাকুর মুসলমানের রাজ্যে জামিনদার ছিলেন। রাজা হরিশ [illegible] জামিনদার করিয়া পাঠাইয়া চন্দ্রমণি ঠাকুরকে সেখান হইতে আনাইলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুর [illegible] আসিবার সময় লাল নিশান ছয়টি ও হাতী চারিটি সঙ্গে আনিলেন। ঐ চারিটি হাতীর [illegible] উপরে বনাত দিয়া ঢাকনি এবং উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহনা দেওয়া ছিল। [illegible] বনাতের জিন ও রুপার মুখছাউনি দেওয়া তুর্কি ঘোড়া দুইটি, টাঙ্গন ঘোড়া ছয়টি, [illegible] ছয় জন এবং ঢালী, বরকন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া প্রায় আশি জন লোক [illegible] ঠাকুরের সঙ্গে দরবারে আসিল। সেই সময়ে চন্দ্রমণি ঠাকুরের পরনে ছিল সোনালী [illegible] গুজরাটী সোনালী পটুকা, সোনালী কাজ করা জিরা, রুপালী গোছপেছ, কানে মুক্তা, [illegible] একটি ও দুই ছড়া মণি-গাঁথা-মুক্তার মালা এবং ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়। [illegible] পালকিতে চড়িয়া আসিলেন। পালকির ছাউনি বনাত দিয়া ঢাকা এবং বেড়া বনাত দিয়া [illegible] ছিল। পালকির উপরে দুইটি রূপার কলাফুল দেওয়া ছিল ছাউনির দুই মাথায় দুইটি [illegible] মকর মাছের মুখ লাগাইয়া দেওয়া ছিল। ঐ পালকির দুই ধারে সেবকেরা সোনার [illegible] ঢাল দুইখানা ও সোনার হাতলযুক্ত তরোয়াল দুইটি বহিয়া নিতেছিল। ঐ পালকির উপরে [illegible] সেবক একটি আরোয়ান ধরিয়া আসিতেছিল।

তারপর নেমুজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী দুইটি, বনাতের জিনের ঘোড়া [illegible] চামড়ার জিনের ঘোড়া পাঁচটি, ঘোড়সওয়ার পাঁচজন এবং ঢাল-তরোয়াল-ধারী সৈন্য [illegible]

তাহার পরনে ছিল কার্পাস সুতায় তৈরী বুটীদার জামা, বন্দরী ছিটের পটুকা, সামনের দিকে [illegible] দেওয়া রূপালী জিরা, আতলঞ্চের ইজার, শাল কাপড়, এবং কোমরে ছিল একখানি সোনালী কাজকরা জামিয়ার। একজন সেবক একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে করিয়া নেমুজীর দরবারে আসিলেন।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া বড়লোকদের মধ্যে কেহ পালকিতে উঠিয়া কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় ত্রিশ জনের মতন আসিলেন। তাহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল ও তরোয়াল এবং কোমরে ছিল জামিয়ার। পাইক প্রায় এক হাজার পাঁচশত আসিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে ঢাল ও তরোয়াল ছিল। রাজার জয়গানকারী ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, দৈবজ্ঞ,বৈদ্য এবং অন্যান্য যাহারা ছিল সকলেই আসিল। প্রকৃতপক্ষে সেইদিন রাজধানীর লোকদিগকে দরবারে আনা হইল। রাজবাড়ির সম্মুখে রাস্তার দুই-ধারে বড় তোপ দশটি এবং লম্বা কামান কুড়িটি পাতা হইয়াছিল।

তৎপর রত্ন মাণিক্য রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং ঐ সিংহাসনের ঘরে যাহাদের ঢুকিবার নিয়ম আছে তাহারাও ঐ ঘরে গেলেন। যাহাদের ঐ ঘরে সম্মুখের প্রাঙ্গণে থাকিবার নিয়ম তাহারা সেই নিয়মিত জায়গায় রহিল। তখন উদয় নারায়ণ বসিবার জায়গা হইতে উঠিয়া আমাদিগকে নিতে আসিলেন। আমরা সেখানকার দুই দূতের সঙ্গে রূপারদুয়ারী ঘর হইতে সোনার-দুয়ারী ঘরের মধ্যে গেলাম। সেই ঘরের আগের দিকে ছিল রাজা চড়িবার জন্য চারিটি হাতী। উহাদের উপরে বনাতের ঢাকনি এবং কপালে গোলাকৃতি সোনার অলঙ্কার দেওয়া ছিল। হাতীগুলির গা জরির কাজ করা বনাত দিয়া মোড়া ছিল এবং প্রতিটি হাতীর দাঁতে আট জোড়া করিয়া সোনার তারের বালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই ঘরের নিম্ন ভাগে ছিল রাজার চড়িবার জন্য পালকি দুখানা, উহাদের দরজার উপরে সোনার পাত লাগানো ছিল। পালকি দুটির চারদিকে চারটি খুঁটা এবং ঐগুলিতে সোনার কলকা কাটা ছিল। পালকির খুঁটাগুলি রূপা দিয়া তৈরী করিয়া ঐ গুলির উপরে বনাত দিয়া ছাউনি দেওয়া হইয়াছিল এবং ছাউনির দুই মাথায় দুইটি সোনার কলা ফুল বানাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পালকি গুলির গা বনাত দিয়া মুড়িয়া প্রত্যেকটির মাথায় দুইটি করিয়া সোনার বাঘের মুখাকৃতি করিয়া বানাইয়া আটকাইয়া দেয়া হইয়াছিল। পালকির নিকটে রাজার চড়িবার তুর্কী ঘোড়া চারিটি, উহাদের জিন সোনালী রঙের বনাতের তৈয়ারী এবং ঘোড়াগুলির মুখছাউনিও সোনালী রঙের ছিল। সিংহাসন ঘরের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল সোনার ত্রিশূল একখানা এবং চন্দ্রবাণ একটি; তাছাড়া লাল, সাদা, জরদ ও সবুজ রঙের নিশান ছিল প্রায় কুড়িটি। সেখানে চারিজন গুরুজর্বদার সোনার ও রূপার লাঠি লইয়া উপস্থিত ছিল।সেই প্রাঙ্গণের দুই ধারে সোনালী ও রুপালী রঙের লাঠি প্রায় আশিটি রক্ষিত ছিল।

সেই সময়ে আমাদিগকে সোনার দুয়ারী ঘর হইতে নিয়মানুযায়ী তিন জায়গায় নিয়া গেল এবং পরে আমরা সিংহাসন ঘরে ঢুকিলে আমাদের মধ্যে রত্নকন্দলী রাজাকে আশির্বাদ এবং অর্জুনদাস রাজাকে প্রণাম করিল। তখন রাজার আদেশে দেওয়ান আসিয়া আমাদের নিকট পত্র চাহিলেন।

রত্নকন্দলী তাহার মাথার পাগড়ি হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। সেই সময় রাজার আদেশে দেওয়ান আমাদিগকে সভাপন্ডিতদের পঙ্‌ক্তিতে বসিতে বলিলেন এবং আমরা সেখানে বসিলাম। দেওয়ান ঐ পত্র পাঠ করিলেন । পরে দেওয়ান আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রত্নকন্দলী, অর্জুনদাস, আমাদের গোঁসাই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনারা যখন আসেন তখন আপনাদের স্বর্গদেব রাজা কুশলে ছিলেন ত?" আমরা বলিলাম "আমাদের রওনা হওয়ার সময় স্বর্গদেব মহারাজা কুশলে ছিলেন।" দেওয়ান পুনরায় আমাদিগকে বলিলেন " রত্নকন্দলী, অর্জুনদাস আমাদের মহারাজ বলিতেছেন যে, স্বর্গ মহারাজার প্রেমবর্দ্ধক পত্র-সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি আকাঙ্খা করেন যে, স্বর্গদেব রাজা যেন কুসলে থাকেন।" তখন আমরা বলিলাম, উভয় পক্ষেই যেন মহামায়া ঐরূপ করেন। তারপর আমাদিগকে ফুল-চন্দন সুগন্ধ যুক্ত পান-সুপারী দিয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন , এখন আপনারা বাসায় গিয়া আরাম করুন, আপনাদের খাওয়ার সময় হইলে আপনারা উক্ত পত্র-সংবাদের উত্তর পাইবেন।" তখন আমরা রাজাকে আশীর্বাদ ও প্রণাম করিয়া সিংহাসনের ঘর হইতে নামিয়া সোনার দুয়ারী ঘরের দিকে আসিলাম। সেই সময় সিংহাসন ঘরে যুবরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজবংশীয়গণ, কোতোয়াল মুছিব, দেওয়ান, উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ, বৈদ্য ও দেবজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়াইয়াছিলেন। সিংহাসন ঘরের সম্মুখের উঠানে দেশের বড় বড় লোকেরা দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজার আদেশ হইলে সকলকে ফুল-চন্দন, সুগন্ধিযুক্ত সুপারি যাকে যেভাবে দেওয়ার নিয়ম আছে সেই ভাবে দেওয়াঁ হইল। তারপর রাজা উঠিয়া বাড়ির ভেতরে গেলেন। সভাস্থ লোকেরাও নিজ নিজ বাড়িতে গেল। তারপর আমরাও আমাদের বাসায় চলিয়া আসিলাম। ১৬৩৪ শকাব্দের ৬ঠা বৈশাখ তারিখে ত্রিপুরার রাজা রত্ন মাণিক্য আমাদিগকে তাঁহার দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন। সেইদিন রাজার পরনে ছিল চিকন খাছার জামা, সাদা চিকন কাপড়ের পাগড়ি, আঁচলে সোনার ঝালর দেওয়া কার্পাস সুতার পটুকা এবং গুজরাটী আতলঞ্চের তৈয়ারী ইজার এবং তিনি ঘাড়ের উপর একটি সাদা শালের কাপড় লইয়াছিলেন । পাথর খচিত এবং সোনার হাতল যুক্ত একটি খঞ্জর তাঁহার কোমরে ছিল। দুইজন লোক সোনার হাতলের দুইটি শুক্ল চামড়া তাঁহার দুই পার্শ্বে দোলাইতেছিল। চিত্রিত তাল পাতার পাখা দিয়া রাজাকে বাতাস করিতেছিল। রাজার পশ্চাতে বনাতের খাপে রক্ষিত এবং সোনার হাতল যুক্ত তরোয়াল চারিখানা এবং সোনার চক্ষু বিশিষ্ট ঢাল চারটি লইয়া চারিজন সেবক দাঁড়াইয়াছিল। দরবারের সময়ে রাজা এইভাবে বসিয়াছিলেন। সেইদিন দরবারে যাওয়ার জন্য যখন রত্নমাণিক্য রাজার দূত আমাদিগকে নিতে আসিল তখন আমরা দুইজন লোককে বাসায় রাখিয়া যাই। তাহাদিগকে বলা ছিল যে, আমরা দরবারে চলিয়া যাওয়ার পরে তারা যেন ছদ্মবেশ ধরিয়া ত্রিপুরা রাজার দরবারের লোকজন ও সাজ সরঞ্জাম কি পরিমাণ এবং তাহারা কি নিয়মে বা কাজ করে দেখিয়া আমাদিগকে যেন বলে। তাহারা দুইজন ছদ্মবেশ ধরিয়া আমাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দরবারে যাইয়া সমস্ত দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিল।

—o—

সপ্তদশ অধ্যায়

দূতগণ কর্ত্তৃক আসামের যুদ্ধের বর্ণনা

আমরা দরবারে যাওয়ার তিনদিন পর রাত্রি অনুমান দুই দন্ড গত হইলে রাজার দূত উদয় নারায়ণ আমাদিগকে গোপনে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। তখন রাজা সিংহাসন ঘরে সুজনি পাতিয়া বসিয়াছিলেন। সেখানে অপর কোন দরবারের লোক ছিল না। তারপর আমাদের স্বর্গরাজা আমাদের যে গোপন পত্র দিয়াছেন তাহা আমাদের হাত হইতে দেওয়ান লইয়া গোপনে পাঠ করিয়া রাজাকে শুনাইলেন। তখন রাজার আদেশে দেওয়ান আমাদিগকে বলিলেন, রত্নকন্দলী, অর্জুনদাস, পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শুনিলাম, মৌখিক আর কিছু বলিবার আছে কি?" আমরা বলিলাম, স্বর্গদেব মহারাজার আদেশে বড়বড়ুয়া নবাব বলিয়াছেন যে, গো এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিগণকে ধর্মের সহিত প্রতিপালন করাই রাজার ধর্ম, আমরা এই ধর্মীয় রাজারা বিদ্যমান থাকিতে যবন সকলে এই ধর্ম নষ্ট করিতেছে, তজ্জন্য সকলে একমত হইয়া যবনকে নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিলে যশ ও ধর্ম দুই-ই বৃদ্ধি পাইবে। এই কথা জানিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন।" তারপর দেওয়ান বলিলেন, "পত্রের কথা তোমরা পরিপূর্ণভাবে বলিয়াছ।" দেওয়ান আবার বলিলেন, "মাজম খাঁ কি প্রকারে তোমাদের দেশ দখল করিল এবং মনছুর খাঁ গুয়াহাটার (গৌহাটির) গড়ই বা কি প্রকারে দখল করিল?" তখন আমরা বলিলাম, সেই সময়ে আমাদের মহারাজার পিতামহ জীবিত ছিলেন। তিনি বাদুলি ফুকনকে সর্দার নির্বাচত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। বাদুলি ফুকন গুয়াহাটার গড়ে মাজম খাঁর সঙ্গে সাত দিন যুদ্ধ করিলেন। তারপর মহারাজ বাদুলি ফুকনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "পূর্বে বাইশ উমরাহদের সহ নবাব মাজম খাঁর সৈন্য বার বার বিজয় করা হইয়াছে; বর্ত্তমানে এত লোকজন এবং অস্ত্র-শস্ত্র লইয়াও তুমি কিছুই করিতে পারিতেছ না।" এই কথা বলিয়া রাগ করিয়া মহারাজ বাদুলি ফুকনের জন্য স্ত্রীলোকের পোষাকাদি পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে বাদুলি ফুকনের মনে সংশয় জন্মিল এবং সে মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই ঘটনায় আমাদের লোক-লস্কর সকলেই পলায়ন করিল তারপর মাজম খাঁ আসিয়া ছামধরা গড়ে উপস্থিত হইল। মহারাজ এই কথা শুনিয়া ছামধরা গড়ে লোকজন পাঠাইয়া দিলেন। তারপর ছামধরা গড়ে বাইশ দিন ব্যাপি নানাপ্রকারে যুদ্ধ হইল। মাজম খাঁ বহু বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও ছামধরা দুর্গ জয় করিতে না পারিয়া সেই জায়গায় থানা বসাইয়া তাহাতে থাকিতে লাগিলেন। পরে আমাদের লোকজনেরা তাহার ঐ সব থানা জয় করিল এবং মাজম খাঁর সৈন্যদের পথ বন্ধ

করিল। মাজম খাঁর লোকজন কোনও জিনিসপত্র কিনিতে না পারিয়া খাওয়ার অত্যন্ত কষ্ট পাইল। তখন মাজম খাঁ ছামধরা গড় পরিত্যাগ করিয়া গুয়াহাটার দিকে গেলেন এবং সৈয়দ ফিরোজ ও সৈয়দ ছালাকে সুবা নিযুক্ত করিয়া ছামধরায় রাখিয়া গেলেন। তারপর আমাদের লোক-লস্করেরা ছামধরায় গিয়া যুদ্ধ করিয়া সৈয়দ ফিরোজ ও সৈয়দত ছালাকে তাহাদের লোকজনেদের সহ ধরিয়া আনিল। বাদশা এই খবর পাইয়া রামসিংহকে পাঠাইয়া দিলেন। রামসিংহ আসিয়া বহু বীরত্বের সহিত অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াও না পারিয়া রাঙ্গামাটিতে চলিয়া গেলেন। রামসিংহ যুদ্ধ জয় করিতে পারে নাই শুনিয়া বাদশা ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁকে নেওয়াইলেন। তারপর বাদশানন্দন আজম তারাকে বাংলা দেশের সুবা নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন "তুমি আসাম জয় করিও"; এবং রামসিংহকে আজমীঢ়ের যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। আজম তারা আসিয়া যুদ্ধের অবস্থা খারাপ দেখিয়া গুয়াহাটার বড় ফুকনের সহিত সদ্ভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বলিলেন, "কিছুদিনের জন্য আমাকে গুয়াহাটা ছাড়িয়া দাও, আমি পরে আবার উহা তোমাকে ফিরাইয়া দিব; ইহাতে বাদশার নিকট আমার একটা মর্য্যাদা থাকিবে।" আজম তারা গুয়াহাটার বড় ফুকনকে অনেক জিনিসপত্রও দিলেন। তারপর বড়ফুকন নিজে ইচ্ছা করিয়া গুয়াহাটা ছাড়িয়া দিলেন। তখন আজম তারা মন্‌ছুর খাঁকে গুয়াহাটার থানাদার হইয়া থাকিবার জন্য পাঠাইলেন এবং মন্‌ছুর খাঁ আসিয়া গুয়াহাটাতে থানা করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পরে আমাদের মহারাজের পিতা সেই বড় ফুকনকে বধ করিলেন। মন্‌ছুর খাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হইল; মন্‌ছুর খাঁ পলায়ন করিলেন। মন্‌ছুর খাঁর অস্ত্র-শস্ত্র এবং বহু লোক-লস্কর ধরিয়া আনা হইল এবং গুয়াহাটার গড় দখল করা হইল।" আমরা এই সমস্ত কথা বলার পর দেওয়ান বলিলেন "সেই জন্যইত বাদুলি ফুকন এই সময়ে ঢাকায় বাস করিতেছিল।" তারপর রাজা আমাদিগকে বিদায় দিলেন এবং রাজার লোকেরা আমাদিগকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল।

—o—

অষ্টাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরায় মদন পূজা ও মোট খেলা

বৈশাখ মাসের দশ দিন অতীত হইলে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মদন পূজার অধিবাস হইল। ঐ দিন সেই দেশের লোকদের দেশাচার নিয়মে মান্যতা অনুসারে উপহার দেওয়ার নিয়ম [illegible] রাজা সেই নিয়মে সকলকে উপহার দিলেন। আমাদিগকেও সিংহাসন-ঘরে আসিয়া ডিমের কুসুমের রংয়ের জামা, রঙ্গিন পাগড়ি, রঙ্গিন পটুকা এবং রঙ্গিন দোপাট্টা উপহার দিলেন। খেলিবার জন্য আমাদিগকে চামড়ার মোটও দুইটি দিলেন। আমাদের সঙ্গের লোকদিগকে রঙ্গিন পাগড়ি ও দোপাট্টা এবং তাহাদের প্রতিজনকে খেলিবার জন্য একটি করিয়া মোট দিলেন। তারপর সেইদিন আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরের দিন কলাগাছের খোল দিয়া চৌচালা করিয়া একটি ঘর বানাইয়া সাজান হইল। ঐ ঘরের ভিতরে মাটির কামদেবের মূর্ত্তি সাজাইয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইল। এই পূজার আয়োজনে বড় বড় করিয়া লাড়ু বানাইয়া দেওয়া হইল। পূজা শেষ হইলে রাজা আসিয়া কামদেবকে প্রণাম করিয়া সোনার নল দিয়া কামদেবের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন এবং পরে যুবরাজ ও অন্যান্য বড় লোকেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া রুপার নল দিয়া কামদেবের গায়ে ঐরূপ জল দিলেন। তারপর রাজার আদেশে আমরাও কামদেবকে প্রণাম করিয়া কামদেবের গায়ে জল ছিটাইলাম এবং অন্যান্য বাহিরের লোকেরাও পরস্পর জল ছিটাছিটি করিতে লাগিল। সুগায়কেরা তাল মিলাইয়া মৃদঙ্গ সঙ্গে সংকীর্তন করিতে লাগিল। সেইদিন রাজা সাদা পোষাক পরিয়াছিলেন। যুবরাজ প্রভৃতি অন্যান্য লোকেরা রাজার দেওয়া উপহারের কাপড় পরিয়া সেইখানে আসিয়াছিলেন। রাজা কাহাকেও বা ডাকাইয়া আনিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। তারপর রাজা অন্দরে গেলেন, অন্যান্যেরাও নিজ নিজ বাড়িতে গেল। আমরাও আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পরের দিন পূর্ব্বের মত যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লোকেরা দরবারে আসিলেন। আমাদিগকেও দরবারে আনা হইল। তারপর রাজা অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সেইদিন রাজার পরনে ছিল গুজরাটী সোনালী তসরের জামা, সোনালী কাজকরা জিরা, সোনালী গোছপেছ, সোনালী পটুকা এবং সোনালী বুটিদার ইজার। একখানা সাদা শাল কাঁধের উপর লইয়াছিলেন। সোনার তরোয়াল দুইটি এবং হীরা ও পাথর

খচিত কলকা একটি হামাই চরাই পাখীর পাখার সঙ্গে পাগড়িতে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। মুক্তা ও পান্নায় গাঁথা একটি মালা দুই পেঁচ করিয়া পাগড়িতে পরিয়াছিলেন। রাজার কানে মুক্তা এবং গলায় হীরা ও পাথর খচিত কণ্ঠাভরণ এবং ঐ কণ্ঠাভরণে মুক্তার ঝালর দেওয়া ছিল। ঐ কণ্ঠাভরণের মাঝখানে হীরাখচিত দুগ্‌দুগী একটি ছিল। নাভি পর্য্যন্ত ঝুল দিয়া তিন পেঁচ করিয়া মুক্তার মালা পরিয়াছিলেন। হাতের দশ আঙ্গুলে দশটি হীরা ও পাথর খচিত আংটি পরিয়াছিলেন এবং কোমরে হীরা ও পাথর খচিত খঞ্জর একখানা লইয়াছিলেন।

রাজা এইরূপে সাজিয়া আসিবার সময়ে হাতীর উপরিভাগ সাজান হইতেছিল। হাতীর উপরে চারিখানি তক্তা দিয়া জোড়া করিয়া আসনটির ঘেরাট করা হইয়াছিল। সেই তক্তার উপর হাতীর দাঁতের নানারূপ কাজ করা ছিল। সোনার পাতও উহাতে মারা ছিল। এই তক্তাগুলির মাঝখানে মূল আসনটি বসান হইয়াছিল। চারিদিকে চারিটি সোনার খুঁটি দিয়া তাহার উপরে চারিচালের বনাতের ঘর সাজান হইয়াছিল। সেই ঘরের চারিধারে বনাত কাটিয়া পানের আকারে বানাইয়া তাহাতে সোনার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বনাতের ঘরের উপরে সোনার তৈয়ারী কলাফুল একটি দেওয়া হইয়াছিল। মূল আসনের তলে দিয়া হাতীর পেটের সহিত দড়ি দিয়া পেঁচ দিয়া বাঁধা হইয়াছিল। রাজা হাতীতে উঠিয়া ঐ ঘরে গালিচার উপরে বসিলেন। তারপর যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লোকেরা আসিলেন। তামাশা দেখিবার জন্য অনেক লোকও আসিল। রাজা আমাদিগকেও সেখানে নেওয়াইলেন। তারপর রাজা মোট খেলিবার জন্য গোমতী নদীতে আসিলেন। সেই সময়ে রাজার আগে আগে হাতীর উপরে, ঘোড়ার উপরে এবং মাটিতে মানুষ নিশান লইয়া যাইতেছিল। তাহাছাড়া লোক হাতীর উপরে নাকাড়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল। ঢাল, তরোয়াল এবং বন্দুক লইয়া অনুমান এক হাজার পাঁচশত লোক এবং ঘোড়-সওয়ার চল্লিশ জন ও চৌদ্দটি হাতী রাজার সঙ্গে নদীর দিকে যাইতেছিল। সোনার এবং রুপার লাঠি লইয়া চারজন গুরুজবর্দার চলিয়াছিল। রাজার নিকটে একপাশে অপর একটি হাতীতে চড়িয়া একজন লোক একটি আরোয়ান ধরিয়াছিল এবং অপর একজন লোক একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া চলিয়াছিল; এবং রাজার অপর পাশে অন্য একটি হাতীতে উঠিয়া একজন লোক রাজাকে চামর ঢুলাইতেছিল এবং অপর একজন ঢাল ও তরোয়াল লইয়া উপস্থিত ছিল। রাজার আগে আগে শিবের ত্রিশূল অর্থাৎ চন্দ্রবাণ লইয়া একজন চলিয়াছিল। রাজার পিছে পিছে গিয়াছিল ঘোড়-সওয়ার অনুমান বিশ জন এবং ঢাল-তরোয়াল এবং বন্দুক-ধারী লোক অনুমান দুই হাজার। তাহাছাড়া যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লোকেরা মর্য্যাদা অনুযায়ী নিজ নিজ সরঞ্জাম ও লোকজন লইয়া কেহ বা হাতীতে কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়া গোমতী নদীর দিকে গেলেন। তামাসা দেখিবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল তাহারাও রাজার আগে এবং পিছনে নদীর দিকে গেল। সেই দিন রাজার সঙ্গে অনুমান দশ বার হাজার লোক গোমতী নদীতে গিয়াছিল। রাজা এইরূপে গিয়া গোমতী নদীর জলে হাতীর উপরে বসিয়া রহিলেন। পরে যুবরাজ ও অন্যান্যেরা জলে নামিয়া দুই ভাগ হইয়া মোট দিয়া পরস্পরের প্রতি জল ছিটাইয়া খেলিতে লাগিলেন। গোমতী নদীর নিকটে একটি কুঁজী ঘর

ছিল। রাজার আদেশে আমরা সেখানে বসিলাম। রাজার লোকেরা আমাদের সঙ্গের লোকজনকে সেই খেলিবার জন্য নিয়া গেল এবং তাহারাও খেলার জায়গায় গিয়া খেলায় যোগ দিল। তারপর রাজা সেখান হইতে গিয়া অমরসাগর দিঘিতেও এইরূপ আমোদ ভোগ করিলেন। রাজা এইরূপে সেই খেলার তামাশা দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; অন্যান্যেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল। আমরাও আমাদের বাসার দিকে রওনা হইলাম।

তারপর রাজার আদেশে কামদেবের পূজায় যে সমস্ত দধি, দুগ্ধ, ক্ষীরের লাড্ডু, ভাঙ্গের লাড্ডু ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ভাগ করিয়া বড় বড় লোকদের ও অন্যান্য ভাল লোকদের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহাছাড়া রাজা সেই সময় সকলকে পোশাক-পরিচ্ছদও দিয়াছিলেন। আমাদিগকেও পোশাক দিয়াছিলেন। রাজা বাহিরে যাওয়ার সময় এবং নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় নগরের স্থানে স্থানে দশ পাঁচ জন স্ত্রীলোক একত্র হইয়া কলাগাছের চারা লাগাইয়া তার নীচে প্রদীপ ও ঘট রাখিয়া উলুধ্বনি করিতেছিল। সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদের জন্য রাজার আদেশে রাজার লোকজন আধুলি, সিকি, দোয়ানি, এক আনি, আধ আনি মুঠ মুঠ করিয়া উড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছিল।

—০—

ঊনবিংশ অধ্যায়

রাজার বিরুদ্ধে ঘনশ্যামের সৈন্য-সংগ্রহ

মোট খেলার দুই চারিদিন পর রাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্য লোক দিয়া মোট খেলার উপহার পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বড়-ঠাকুর, আজ ছয় মাস হয় হাতী ধরিবার জন্য গিয়াছ, এখনও আসিলে না। আমাদের এখানে স্বর্গ রাজার দূতগণকে দরবারে সংবর্ধনা করা হইয়াছে, মোট খেলাও শেষ হইয়াছে, বর্ষাকাল আগত প্রায়। এখন স্বর্গ রাজার দূতগণকে বিদায় দিবার সময় হইয়াছে। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া সত্বর লোকজন সঙ্গে লইয়া চলিয়া আস।" ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার এই আদেশ শুনিয়া রাজার বরাবরে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে বলিলেন, "গোঁসাই মহারাজ উত্তম আদেশ দিয়াছেন। আমাদের এখানের কাজ শেষ হইয়াছে, আমরা সত্বরই রওনা হইব।" ঘনশ্যাম ঠাকুর এইরূপে পত্র লিখিয়া রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর রাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের পত্র পাইয়া ও পত্রের বিষয় অবগত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ঘনশ্যাম ঠাকুর হাতী ধরিতে যাওয়ার পরেই গোপনে ঢাকায় মুরাদ্‌বেগের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "পূর্বে মির্জার সঙ্গে আমাদের যেরূপ কথা ছিল তদানুযায়ী আমি হাতীধরার জায়গায় থাকিতে থাকিতে লোকজন সঙ্গে করিয়া সত্বর মির্জা আমাদের সহিত একত্র হউক— এই কথা মীর মামুদকে বলিয়া তাহার ভাগিনা মামুদ ছফিককে সঙ্গে করিয়া আনিবা।" মুরাদ্‌বেগ্ বলিয়া পাঠাইল, "কথা অনুযায়ী আমি সমস্তই করিয়াছি। যে সমস্ত লোক পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি এবং আরও লোকের জন্য কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। বড়-ঠাকুরের আদেশ পাইলে ঐ লোকদের দুই এক শত করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। এক্ষণেই আমি সেখানে গেলে ভাল হইবে না বলিয়া মনে করি। আপনি যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।" এই সংবাদ পাইয়া বড়-ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন, "মির্জা ভাল কথাই বলিয়াছেন, যে ভাবে ভাল মনে হয় সেই ভাবেই লোক পাঠাইয়া দিও।" এই সংবাদ পাইয়া মুরাদ্‌বেগ্ হিন্দুস্থানী ঢালী নিযুক্ত করিয়া দুই একশত করিয়া পাঠাইতে লাগিল।

যে সমস্ত লোক ঘনশ্যাম ঠাকুরের সঙ্গে গিয়াছিল তাহারা হাতী ধরিয়াছিল। ঘনশ্যাম গোপনে বঙ্গদেশ হইতে লোক আনাইয়া নিজে রাজা হওয়ার জন্য যে অভিসন্ধি করিয়াছে রাজা তাহা

জানিতে পারিলেন না। ঘনশ্যামের ভয়ে ঘনশ্যামের লোকেরা রাজাকেও এই কথা জানাইল না। ঘনশ্যাম দলে দলে বাঙ্গালাদেশ হইতে লোক আনাইতেছে জানিতে পারিয়া যুবরাজ ও রাজার সেনাপতি কোতোয়াল মুছিব উভয়ে যুক্তি করিয়া গোপনে অন্য সময়ের নিয়মের চেয়ে বেশী করিয়া তীরন্দাজ, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। তাহারা মনে করিলেন যে ঘনশ্যাম বাঙ্গালা দেশের লোকজন নিযুক্ত করিয়া লইয়া আসিতেছে; পাছে সে কিছু অনিষ্ট করে এজন্য আমরাও একটু সতর্ক হই। এদিকে ঘনশ্যাম হাতীধরা শেষ করিয়া মুরাদ্‌বেগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, “মির্জা যে সমস্ত লোক পাঠাইয়াছেন তাহারা আসিয়া আমার এখানে পৌঁছিয়াছে। এখন মির্জা মামুদ ছফিককে পৃথক করিয়া এখানে পাঠাইবেন। মামুদ ছ'ফ আসিয়া এ দেশের লোকদিগকে বলিবে যে সে ইর্শালের পাওনা হাতী লওয়ার জন্য আসিয়াছে। মামুদ ছফির সঙ্গে একত্রে পূর্বে আলাপ করিয়া তাহাকে পাঠাইবা। মির্জা নিজেও ঘোড়-সওয়ার, হিন্দুস্থানী ও তীরন্দাজ যাহা যোগাড় হয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র চলিয়া আসুক।”

পরে মুরাদ্‌বেগ্ এই সংবাদ পাইয়া মীর মুরাদকে এই কথা জানাইয়া ঘোড়-সওয়ার, হিন্দুস্থানী সৈন্য, তীরন্দাজ এইসব সংগৃহীত লোক সঙ্গে দিয়া মামুদ ছফিকে মির্জাপুর পাঠাইয়া দিল। মামুদ ছফি মির্জাপুরে আসিয়া সেখানকার লোকদিগকে বলিলেন যে “যুবরাজ চম্পক রাইয়ের সময়ের হাতী পাওনা রহিয়াছে। সেই হাতী নিয়া যাওয়ার জন্য আমি আসিয়াছি।” ঘনশ্যাম ঠাকুর যে নিজে রাজা হওয়ার জন্য তাহাদিগকে আনাইয়াছেন এ কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিলেন না। পরে মুরাদ্ বেগ্ ঘোড়-সওয়ার, বরকন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি লোক নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে করিয়া ঢাকা হইতে আসিয়া ঘনশ্যাম ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিল। এদিকে ঘনশ্যাম ঠাকুর ধরা হাতীগুলি আনিবার জন্য প্রয়োজনীয় লোক নিযুক্ত করিয়া কাজের শৃঙ্খলা করিয়া দিলেন। ঐ সমস্ত হাতীর মধ্যে দশটি প্রথমে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঐ হাতীর সঙ্গে যে যে লোক প্রয়োজন তাহাও দিলেন এবং রাজার আপনজন বলিতে যাহারা সঙ্গে ছিল তাহাদিগকেও সেই সঙ্গে রাখিলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে “পূর্বে মুরাদ্‌বেগ্ অসন্তুষ্ট হইয়া ঢাকায় চলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে প্রবোধ ও ভরসা দিয়া লোক পাঠাইয়া আনাইয়াছি; আমার সঙ্গে একত্রে সে যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।” ঘনশ্যাম কপটতা করিয়া ঐ সংবাদ রাজাকে পাঠাইলেন। তারপর ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মুরাদ্ বেগ্‌কে সঙ্গে লইয়া লোক-লস্করের সহিত হাতীধরার জায়গা হইতে চলিয়া আসিয়া মির্জাপুরে মামুদ ছফির সঙ্গে মিলিত হইলেন।

ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বিদেশের লোক-লস্কর সঙ্গে লইয়া আসিতেছে শুনিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব একত্রে পরামর্শ করিয়া গোপনে রাজাকে বলিলেন, “ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বঙ্গ দেশের অনেক লোক-লস্কর নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এ বিষয়ে মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন পাছে সে কোনও বিপদ না ঘটায়; এ বিষয়ে ভাল কথা শুনিতেছি না।” এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, “তোমরা কোনও সন্দেহ করিও না। ঘনশ্যাম আমাকে

জানাইয়া আসিতেছে। সে বলে যে সে মুরাদ্ বেগকে নিয়া আসিয়াছে এবং মুরাদ্ বেগের সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়াছে। তবু যখন তোমরা এরূপ বলিতেছ আমি লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইব।" রাজা এই কথা বলিয়া তাহাদের দুইজনকে নিজ নিজ বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর রাজা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে আমাকে জানাইয়াছ যে মুরাদ্ বেগের সঙ্গে কিছু লোক আসিয়াছে, কিন্তু এখন শুনিতেছি যে তাহার সঙ্গে বহু সৈন্য সামন্ত আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন "আমি মহারাজার আদেশের দাস। মহারাজ মুরাদ্ বেগকে আনিতে বলিয়াছেন তজ্জন্য আমি মুরাদ্‌বেগকে আনাইয়াছি; তাহার সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়াছে। হাতীর ইর্শালের বিষয়ে মামুদ ছফিও আসিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে কিছু লোকজনও আসিয়াছে। আমি মামুদ ছফিকে কি বলিতে পারি? মহারাজ আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলে। এ বিষয়ে মহারাজ নিজে চিন্তা করিয়া দেখিলেই ভাল হয়। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে এইরূপ ঝগড়া কলহের দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহাও মহারাজ জ্ঞাত আছেন।" ঘনশ্যামের লোক এইরূপে রাজাকে জানাইয়া চলিয়া আসিল।

—o—

বিংশ অধ্যায়

ঘনশ্যাম, মুরাদ্‌বেগ্ এবং মামুদ ছফির মন্ত্রণা

তারপর ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর, মুরাদ্‌বেগ্ এবং মামুদ ছফি এই তিনজন পরামর্শ করিয়া মামুদ [illegible] এক পত্র লেখাইয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল, "চম্পক রাইয়ের [illegible] যে সব হাতী দেওয়া বাকী রহিয়াছে তাহা মহারাজ দেন নাই, এ বিষয়ে পূর্বেও বার বার [illegible] হইয়াছে। যদি বাদশা এই কথা জানিতে পারেন তবে অমঙ্গল হইবে। আমি নিজে এ বিষয়ে [illegible]জের সাক্ষাতে বলিলে ভাল হইবে বলিয়া মনে করি। ঘনশ্যাম ঠাকুরকেও বলা হইয়াছে; [illegible] সে বলে যে "চম্পক রাইয়ের সময়ে তোমরা কেন হাতী লইলে না? এখন আমরা কেমন [illegible] ঐ বাকীপড়া হাতী দিব?"

তারপর ঘনশ্যাম মুরাদ্‌বেগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মামুদ ছফিকে বলিলেন, "দেশের সকল [illegible] রাজার ইষ্ট। তুমি বুদ্ধি করিয়া আমাকে রাজা কর, আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিব।" [illegible] মামুদ্ ছফিকে বলিল, "সাহেব যদি বড়ঠাকুরকে রাজা করেন তবে এ দেশের সকল [illegible] সাহেবের ক্ষমতা টের পাইবে।" তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, "মীর মুরাদ আমাকে বলিয়া [illegible] যে, যদি দেশের লোকজন রত্নমাণিক্য রাজার কারণে কষ্ট পায় এবং যদি তাহারা ঘনশ্যামকে [illegible] করিতে চাহে তবে দেশের লোকজনের পক্ষে সাহায্য করিও এখন তোমরা বলিতেছ যে [illegible] সকল লোকজন রাজার হিতৈষী। এই অবস্থায় আমি কিরূপে এই কার্য্যে অনুমতি দিব? [illegible] তোমাদের কথামত যুবরাজের চাকরি তোমাকে দেওয়া হইবে এবং কোতোয়াল মুছিব [illegible] যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা দূর করা হইবে। তখন মুরাদ্‌বেগ্ বলিল, "এখন বড়ঠাকুরের একটি [illegible] বলিবার প্রয়োজন নাই। সাহেব যখন রাজধানীতে পৌঁছিবেন তখন যেরূপ উচিত মনে [illegible] তাহাই করিবেন।" ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, "মির্জাই আমার সব ভরসার স্থল; মির্জা [illegible] কখনও ফেলিতে পারিবেন না।" তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, "বড়ঠাকুরের ভোগে যাহা [illegible] আছে তাহাই হইবে। তথাপি তোমরা আমাকে যে বলিতেছ তাহাতে আমি বলি যে আমার [illegible] সম্ভব তাহা আমি করিব।"

তখন ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, আমাদের তিন জনের মধ্যে যেন কোন মতানৈক্য না হয় তজ্জন্য আমাদের একটি শপথ গ্রহণ করা দরকার এবং তবেই কেবল আমরা এই ব্যাপারে নিঃসংশয় হইতে পারি।" মামুদ ছফি বলিলেন, "ভাল কথা, যাহা করিলে তোমাদের মনের সংশয় দূর হয় তাহাই কর।" তারপর তামা, তুলসী ও কোরাণ তিন জনের সম্মুখে রাখা হইল এবং তাহারা বলিলেন, "এই প্রতিজ্ঞার কথা কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিবে না, করিলে তাহার ধর্ম্মহানি হইবে এবং ঈশ্বর ও খোদা তাহাকে শাস্তি দিবেন।" এইরূপে তিনজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মির্জাপুর হইতে উদয়পুর নগরে আসিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মামুদ ছফি পত্র পাইয়া রাজা যুবরাজ ও কোতয়াল মুছিবকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং বলিলেন, "মামুদ ছফি চম্পক রাইয়ের সময়ের বাকীপড়া হাতীর কথা লিখিয়াছে। মামুদ ছফি ঘনশ্যাম ঠাকুরকেও বলিয়াছিল কিন্তু সে এ বিষয়ে খামাখায় নাই, তবু তোমরা ঘনশ্যামের দোষ দেও! তাহার কোনও দোষ নাই। ঘনশ্যাম বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক লোক আনাইয়াছে বলিয়া তোমরা যে সন্দেহ করিতেছ তাহারা মামুদ ছফির সঙ্গে আসিয়াছে; ঘনশ্যাম তাহাদিগকে আনায় নাই।" এই কথা বলিয়া রাজা মামুদ ছফি যে পত্র পাঠাইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন, "মামুদ ছফি যখন আসিতে চায় তাহাকে কি আসিতে না দেওয়া ভাল হইবে? না আসিতে দেওয়াও ত ভাল মনে হয় না।" তখন যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব বলিলেন, "মহারাজকে যে পত্র লেখা হইয়াছে তাহা চতুরতাপূর্ণ, আসল কথা অন্যরূপ। ঘনশ্যাম ঠাকুর মামুদ ছফি ও মুরাদ্‌বেগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিদেশ হইতে লোকজন আনাইয়া বিপদ ঘটাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছে। মহারাজ বিশেষ করিয়া এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন। এই কথা নিশ্চয় মনে করিয়া মহারাজ আমাদিগকে আদেশ দেন যেন আমরা লোকজন লইয়া চণ্ডীগড়ে গিয়া অপেক্ষা করি এবং সেখানে থাকিয়া আমরা ঘনশ্যাম ঠাকুর, মুরাদ্‌বেগ্‌ ও আমাদের দেশের লোকজনকে আনিয়া তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া পরে তাহাদের সঙ্গে আমরা একত্রে রাজধানীতে আসি। মামুদছফি নিজের লোকজন লইয়া মির্জাপুরে অপেক্ষা করুক। পরে মহারাজ আলোচনা করিয়া যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করিবেন। তারপর রাজা বলিলেন, "ঘনশ্যাম আমার কনিষ্ঠ ভাই হয়। তাহাকে আমি বড়ই বিশ্বাস করি। সে আমার শত্রুতা কেন করিবে! ঘনশ্যামকে একটুও সন্দেহ করিও না। মনে হয় মামুদ ছফির সঙ্গে ঘনশ্যাম আসিলেই ভাল হয়, কারণ তাহা না হইলে পরিণামে খারাপ হইতে পারে।" রাজা এই কথা বলার পর যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব বলিলেন, "আমরা মনে প্রাণে মহারাজের মঙ্গলচিন্তা করিয়া যাহা বলা উচিত তাহাই বলিলাম; কিন্তু আমাদের কথা মহারাজের মনে প্রবেশ করিতে পারিল না। মহামায়া যাহার জন্য যতখানি ভোগ্য নির্দিষ্ট করেন সে তাহাই ভোগ করে। আমাদের পৌরুষের দ্বারা কোন ফল হয় না। এখন বুঝিতে পারিলাম ভগবতী আমাদের উপর বড়ই রুষ্ট হইয়াছেন তাহাছাড়া যার কর্ম্মফল যেরূপ আছে তাহা কেহই খণ্ডাইতে পারে না।" এই কথা বলিয়া যুবরাজ ও কোতয়াল মুছিব অসন্তুষ্ট চিত্তে নিজ নিজ বাড়িতে চলিয়া আসিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

রাজধানীর নিকটে সসৈন্যে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর

তারপর রাজা ঘনশ্যাম ঠাকুর মামুদ ছফিকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে আসুক-এই বলিয়া খবর পাঠাইয়া দিলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার আদেশ শুনিয়া লোকলস্কর ও মামুদ ছফিকে সঙ্গে লইয়া উদয়পুর নগরে আসিলেন এবং রাজবাড়ি হইতে কিছু দূরে গোমতী নদীর অপর পাড়ে তাম্বুকানাত খাটাইয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইদিন ঘনশ্যামরাজার নিকট আসিলেন না। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি মামুদ ছফির সঙ্গে আসিয়া এখানে আছি; পরে দিন-ক্ষণ দেখিয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।" তারপর রাজা মামুদ ছফির জন্য সিধা ও ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্য ফুলচন্দন এবং রুপার বাটায় করিয়া কাটাসুপারি ও পান পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন ঘনশ্যাম ঠাকুর, মামুদ ছফি ও মুরাদ্‌বেগ্ একত্র হইয়া আলোচনা করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব দেশের প্রধান এবং রাজার বড়ই আপনার লোক। তাহাদিগকে আনাইয়া আমাদের এখানে বন্দী করিয়া না রাখিলে কেমন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি হইবে?" তখন ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মামুদ ছফিকে বলিলেন, "মীর্জ্জা বুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে আনাইলে তাহারা এখানে আসিবে; আমার কথায় তাহারা কেন আসিবে?" তখন মামুদ ছফি ঘনশ্যাম ঠাকুরকে বলিলেন, "তুমি বন্ধুভাবে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাও এবং বল যে মুরাদ্‌বেগকে আনা হইয়াছে; সে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ভয় পায়, সে আমার আশ্বাসে ভরসা করে না; তজ্জন্য তোমরা দুইজন আমাদের এখানে আইস। তোমাদের সঙ্গে আমিও মুরাদ্‌বেগ্‌কে লইয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং সেই সঙ্গে আমাদের লোকেরাও মহারাজের নিকট গিয়া, আমি মুরাদ্‌বেগ্‌ক আশ্বাস দিয়াছি, একথা মহারাজকে বলিবে। এই কথা বলিয়া তুমি তাহাদের নিকট খবর পাঠাইয়া দেও এবং কি কারণে তাহাদিগকে ডাকাইয়াছ তাহাও রাজাকে জানাইয়া খবর পাঠাইবা।" তখন মুরাদ্‌বেগ বলিল, "মীর্জ্জা সাহেব ভাল কথাই বলিয়াছেন; বড়ঠাকুর ঐরূপে কাজ করিলেই ভাল হইবে।"

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর ও মামুদ ছফি উভয়ে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন "তোমরা আমাদের এখানে আইস, তোমাদের সঙ্গে আমরা একত্র হইয়া মুরাদ্‌বেগকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।" এইরূপে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবের নিকট খবর পাঠাইয়া দিলেন এবং কি কারণে তাহাদের দুইজনকে ডাকা হইয়াছে তাহাও রাজাকে জানাইয়া খবর পাঠাইলেন। তারপর ঘনশ্যামের লোক গিয়া যুবরাজকে এই খবর জানাইলে তিনি বলিলেন, "আজ একাদশীব্রত করিয়াছি, আমি যাইতে পারিব না" এবং কোতোয়াল মুছিবকে বলিলে তিনি বলিলেন "আমার শরীর ভাল না, আমি যাইতে পারিব না।" তাহারা দুই জনেই গেলেন না। ঐ লোক ফিরিয়া আসিয়া মামুদ ছফি ও বড়ঠাকুরকে এই সংবাদ জানাইল। তাহারা দুই জনেই আসিল না দেখিয়া মামুদ ছফি বড়ঠাকুরকে বলিলেন, "তাহাদের দুইজনকেই খবর দেওয়া হইল, তাহারা আসিল না। দেশের লোকজনদের বশ করা হইল না। আমি একাকী তোমাকে রাজা করিতে পারিব না। তাহাছাড়া আমার উপর মীর মুরাদের এরূপ আদেশ নাই। আমি তোমার এই কাজ করিতে পারিব না।" তখন ঘনশ্যাম ঠাকুর মামুদ ছফিকে বলিলেন, "আমি তোমার উপরই সমস্ত নির্ভর করিয়া আছি, এখন তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর তবে আমার বধের কারণ তুমিই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার ধর্ম্ম ও হানি হইবে। আমি মীর মুরাদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিব। তুমি মীর মুরাদের কথা ভাবিয়া একটুও বিচলিত হইও না।" তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার দেশের দুই চারিজন প্রধান লোক সঙ্গে লও।" ঘনশ্যাম ঠাকুর বলিলেন, "ভালই হইল, আমার ভাই চন্দ্রমণি ঠাকুর ও জয়সিংহ কার্কোনকে আমার সঙ্গে লইব।" তখন মামুদ ছফি বলিলেন, "এইরূপ দুই চারিজন সঙ্গে থাকিলে মীর মুরাদকে বুঝাইতে সুবিধা হইবে।" এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

—০—

দ্বাবিংশ অধ্যায়

যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবের সৎ পরামর্শ

এদিকে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যাম ঠাকুরের ডাকে না গিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমরা পূর্ব্বে মহারাজকে যে সব কথা বলিয়াছি তাহা মহারাজ গ্রাহ্য করেন নাই। পূর্ব্বাপর নিয়ম আছে যে হাতীধরার জায়গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই দিনই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়। এক্ষণে ঘনশ্যাম ঠাকুর এখানে না আসিয়া নদীর অপর পাড়ে মোগলের সহিত একজোট হইয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদিগকে তাহার ওখানে যাওয়ার জন্য বলিতেছে। পূর্ব্বে কখনও এরূপ নিয়ম ছিল না। আমরা তাহার জায়গায় গেলে পর সে আমাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিবে। মহারাজ আদেশ করিলে এখনও আমরা একটা উপায় করিতে পারি।" তখন রাজা বলিলেন, "তোমরা এরূপ অনুচিত কথা কেন বলিতেছ? এদিকে ঘনশ্যাম আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে মুরাদ্‌বেগ্ আমার নিকট অপরাধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; এমন কি সে শাস্তি পাইবারও উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত হয় না। এই রকম ভাল মানুষ দেশে দুই-চারি জন থাকা দরকার। মুরাদ্ বেগের মনে বড়ই ভয় হইয়াছে। এই জন্য ঘনশ্যাম বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, সে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবের সঙ্গে একত্রে আসিয়া আমার নিকট মুরাদ্ বেগের অপরাধের জন্য মার্জনা মঞ্জুর করাইবে। এই কথা ঘনশ্যাম মনে স্থির করিয়া তোমাদের দুই জনকে তাহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইয়াছে এবং সে নিজে আসে নাই। ঘনশ্যাম এই সমস্ত কথা আমাকে জানাইয়াছে। তোমরা কোনও সন্দেহ করিও না। তোমরা তাহার কাছে যাও।" তারপর যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব বলিলেন, "আমরা বার বার সে সব কথা মহারাজকে জানাইয়াছি তাহা মহারাজ ভাল মনে করেন নাই। ঘনশ্যাম ঠাকুর মোগলের যুক্তিতে এই কৌশলজাল সৃষ্টি করিয়াছে। মহারাজ দৈব-দোষে এসব কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা অরণ্যে রোদন করিলে কি ফল হইবে!"

এই কথা বলিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব অসন্তুষ্ট চিত্তে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। তারপর কোতোয়াল মুছিব তাহার স্ত্রী অর্থাৎ রাজার ভগ্নীকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়া

বলিলেন, "আমরা অনেক করিয়া রাজাকে বুঝাইলাম কিন্তু রাজা আমাদের কথা শুনিলেন না। তুমি গিয়া রাজাকে বুঝাইয়া বলিবে যে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রাজাকে সরাইয়া দিয়া নিজে রাজা হইবে এবং আমাদিগকেও বধ করিবে। মহারাজ যেমন এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া জানিয়া রাখেন।" তারপর রাজার ভগ্নী রাজার নিকট গিয়া রাজাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন।

তারপর রাজা তাঁহার ভগ্নীকে বলিলেন, "তুমি মেয়েলোক কিছুই জান না। তোমার স্বামী তোমাকে যেরূপে বুঝাইয়াছে তুমি সেই রূপে বুঝিয়াছে। তুমি আমার যেরূপ সরলা ভগ্নী........

—০—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামের নিকট গেল।

(মূল পুথিতে এই জায়গায় একটি পাতা নাই। ঐ পাতাটি না থাকিলেও ঘটনার ধারাবাহিকতা পরিষ্কার বুঝা যায়। রত্নমাণিক্য রাজা তাঁহার ভাই ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের কোনও দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। রাজা তাহার ভগ্নীর কথাও শুনিলেন না, পরম হিতাকাঙ্খী যুবরাজ দুর্জয় সিংহ এবং কোতোয়াল মুছিব রাজদুর্লভ নারায়ণের পরামর্শও ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট যাইতে বাধ্য হইলেন।

মূল পুথির নির্ঘন্টে ঐ হারাইয়া যাওয়া পাতা সম্পর্কে এই রূপ লিখিত আছে যে, "যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামের নিকট গেল।" শ্রীত্রিপুর চন্দ্র সেন, ১লা জুন, ১৯৬৪ ইং)

– ....মিত্র সহ মহারাজের নিকট অপরাধের ক্ষমা চাহিলেই ভাল হইবে বলিয়া মনে করি।" তারপর মুরাদ্‌বেগ বলিল, "যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবের আদেশ আমার সর্ব্বদাই পালনীয়। যাহাতে আমার প্রাণরক্ষা হয় আপনারা তাহাই করুন। আমার অধিক আর কি বলিবার আছে!" তখন যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব বলিলেন, "তুই মনের আবেগে অন্যায় কথা প্রকাশ করিয়াছিস। তোর এমন বিরুদ্ধ কথার জন্য আমরা রাজার নিকট কথা বলিতে সংশয় বোধ করিতেছি। তবুও তোর জন্য আমরা বড়ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া রাজার নিকট বলিব।"

তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, "তাহারা ভালই বলিয়াছে।" তখন ঘনশ্যাম ঠাকুর বলিলেন, "কাল সকালে একত্র হইয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।" তাহারা এই রূপে ছল করিয়া রাত্রি করাইল।

—০—

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ঘনশ্যামের হাতে কোতোয়াল মুছিব বন্দী

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর কোতোয়াল মুছিবকে বলিলেন, "আজ তুমি আমার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করিয়া এখানে থাকিবা।" এই বলিয়া কোতোয়াল মুছিবের হাতে ধরিয়া ভিতরে নিয়া গিয়া তাহাকে শৃংখলাবদ্ধ করিলেন।

মামুদ ছফি ও যুবরাজ তাহাদের নিজ নিজ জায়গায় বসা রহিলেন। তখন যুবরাজ বিপজ্জনক অবস্থা দেখিয়া মামুদ ছফিকে আত্ম সমর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মামুদ ছফিও গোপন ইঙ্গিতে কিছু বলিলেন। সেই সময়ে ঘনশ্যাম ঠাকুর অন্তরাল হইতে বলিয়া পাঠাইলেন "যুবরাজ আজ আমাদের সঙ্গেই থাকুক।" তখন যুবরাজ নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া মামুদ ছফির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর এবং আমার যুবরাজের চাকরিও বহাল রাখ। আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিব।" তখন মামুদ ছফি বলিলেন, "আমি তোমাকে কৌশল করিয়া রক্ষা করিব, ইহাতে তুমি একটুও সন্দেহ করিও না।" তখন যুবরাজ বিশেষ করিয়া মামুদ ছফিকে বলিলেন, "আজ আমাকে আমার বাড়িতে পাঠাইয়া দেও, তাহা হইলে আমার মনের সন্দেহ দূর হইবে।" মামুদ ছফি বলিলেন, "বেশ দেখ আমি কি করিতে পারি।" তারপর মামুদ ছফি ঘনশ্যাম ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন "যুবরাজ এখানে থাকিলে ভাল হইবে না, যুবরাজ ঘরে যাক। তাহাদের দুই জনকেই এখানে রাখিলে রাজার মনে সন্দেহ হইবে।" ইহাতে ঘনশ্যাম ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন, মীর্জ্জা যদি ভাল মনে করেন তবে তাহাই করুন, তবে যুবরাজকে ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। আগামীকাল পুনরায় এই ঘোড়সওয়ারেরা যুবরাজকে এখানে নিয়া আসিবে।" তখন মামুদ ছফি দশজন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে দিয়া যুবরাজকে তাহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। মামুদ ছফি ঘোড়সওয়ারগণকে বলিয়া দিলেন, "আজ তোরা যুবরাজের বাড়িতে থাকিস এবং কাল প্রাতঃকালে যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসিবি।" তারপর সেই ঘোড়সওয়ারগণের সঙ্গে যুবরাজ নিজ বাড়িতে ফিরিলেন। ঘনশ্যাম রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন "কোতোয়াল মুছিবকে আমাদের এখানে রাখিয়াছি, আজ আমরা দুইজন এখানে আনন্দে কাটাইয়া কাল মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব" এবং এইরূপ অপর একটি সংবাদ ভগ্নীকে (কোতোয়াল মুছিবের স্ত্রী) ও পাঠাইয়া দিলেন।

—০—

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

যুবরাজ গোপনে রাজাকে সমস্ত বিষয় জানাইল

যুবরাজ ঘনশ্যাম ঠাকুরের জায়গা হইতে নিজ ঘরে ফিরিলেন এবং সঙ্গে যে সব ঘোড়সওয়ার আসিয়াছিল তাহাদের খাওয়ার জন্য সিধা ও আবশ্যকীয় জিনিসাদি দিলেন। তারপরে ছদ্মবেশ ধরিয়া একটি চাকর সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট গেলেন। পরে রাজার নিকট খবর পাঠাইলে রাজা তাহাকে অন্দরের ভিতরে নেওয়াইলেন। রাজা তাহার এই পোষাক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এইরূপ বেশ ধরিয়া কেন আসিয়াছ?" যুবরাজ বলিলেন, "মহারাজকে কি বলিব! আমার শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে। কোতায়াল মুছিব ও আমি বড়ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম। ঘনশ্যাম ঠাকুর মুরাদ বেগকে মহারাজের নিকট উপস্থিত করার কথা লইয়া আলাপ করিতে করিতে ছল করিয়া রাত্রি করিল। পরে কোতোয়াল মুছিবকে ভিতরে লইয়া গিয়া হাতকড়ি লাগাইল এবং আমাকেও বন্দী করিল। তখন আমি মামুদ ছফিকে দশ হাজার টাকা দিব স্বীকার করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি ঐ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও ঘোড়সওয়ার সঙ্গে দিয়া আমাকে আমার বাড়িতে আসিতে অনুমতি দিয়াছে। ঐ ঘোড়সওয়ারেরা আমাকে পাহারা দিয়া রাখিয়াছে। কাল প্রত্যুষে তাহারা আবার আমাকে ঘনশ্যামের নিকট লইয়া যাইবে। আমি ছদ্মবেশ ধরিয়া পিছনের দরজা দিয়া লুকাইয়া মহারাজকে সব কথা বলিতে আসিয়াছি। আমি যে লুকাইয়া এখানে আসিয়াছি তাহা ঐ ঘোড়সওয়ারেরা টের পায় নাই। আগামীকাল ঘনশ্যাম ঠাকুর মহারাজকে সরাইয়া দিয়া নিজে রাজা হইবে। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে আমাকে ও কোতোয়াল মুছিবকে প্রাণে বধ করিবে। এখনও মহারাজ আদেশ দিলে উপায় করিতে পারি। আমাদের দেশের লোকজনের মহারাজের প্রতি অনুরাগ আছে। আমরা যদি হাদিরিবাদ্য বাজাই তাহা শুনিয়া দেশের লোকজন আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র হইবে। তারপর আমরা দুর্গের ভিতরে সতর্কতার সহিত অবস্থান করিলে তাহারা আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না এবং পরে কোতোয়াল মুছিবকেও উদ্ধার করা যাইবে এবং ঘনশ্যামকে ধরা সম্ভব হইবে। আমাদের কৃতকার্য্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এখন মহারাজের আদেশ পাইলেই হয়।"

তখন রত্নমাণিক্য রাজা বলিলেন, "তোমরা কিছুই বোঝনা, রজ্জুকে সর্প মনে কর। ঘনশ্যাম আমাকে জানাইয়াছে যে সে কোতোয়াল মুছিবকে তাহার কাছে রাখিয়াছে এবং আজ সেখানে আনন্দে কাটাইয়া আগামীকাল তাহারা আমার সঙ্গে দেখা করিবে। এখন তোমরা কাটাকাটি করিতে চাও। ঘনশ্যাম আমার ভাই হয়। সে সমস্ত রকমে যোগ্যপুরুষ। বিনা দোষে তাহাকে বধ করিয়া আমার কি সুখ হইবে! তাহা ছাড়া ভ্রাতৃহত্যার পাপ হইবে এবং লোকসমাজেও আমার নিন্দা থাকিয়া যাইবে। পূর্ব্বেও তোমরা এইরূপ কুপরামর্শ দিয়া চম্পকরাইকে বধ করাইয়াছ। চম্পকরাই মারা যাওয়ার পর হইতেই মোগলেরা দেশের বহু অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইরূপ অযৌক্তিক কার্য্যে আমি সায় দিবনা। তোমরাও আমাকে এইরূপ অন্যায় কাজ করিতে বলিও না।" তখন যুবরাজ বলিলেন, "আপনি রামমাণিক্য রাজার পুত্র, তাহা ছাড়া আপনি সাতাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন তথাপি শত্রুর কুচক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না। আপনার ও আমার জন্মের মতন ইহাই শেষ দেখা হইল জানিবেন।" এই কথা বলিয়া যুবরাজ অসন্তুষ্ট চিত্তে নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

—০—

ষড়বিংশ অধ্যায়

ঘনশ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই বলিয়া রওনা হইল।

পরের দিন ঘনশ্যাম ঠাকুর চন্দ্রমণি ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সহায় হও, আমি রাজা হইলে তোমাকে যুবরাজ করিব।" তখন চন্দ্রমণি ঠাকুর বলিলেন, "ভাল কথা, আপনি যে আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।" তারপর ঘনশ্যাম জয়সিংহ নারাণ কার্কোনকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তোমার কন্যাটিকে আমাকে দিবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া মহারাণী করিব। তুমি আমার সহায় হও।" তখন জয়সিংহ নারাণ কার্কোন বলিলেন, "ঠাকুর সাহেব যাহা আদেশ করিবেন আমি কি তাহা না করিয়া পারি!" তারপর ঘনশ্যাম মামুদ ছফিকে বলিলেন, "চন্দ্রমণি ঠাকুর এবং জয়সিংহ কার্কোন আমার সহায় হইয়াছে"। ইহার কতক্ষণ পরে ঘোড়সওয়ারেরা যুবরাজকে ঘনশ্যামের নিকট লইয়া আসিল।

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর ব্রাহ্মণ এবং দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া ঘনশ্যামকে যাত্রা করাইল। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রওনা হইলেন। তাহার সঙ্গে দেশের লোক জনেরা আসিল। বিদেশ হইতে নবনিযুক্ত ঘোড়সওয়ার অনুমান দুইশতজন এবং হিন্দুস্থানী তীরন্দাজ অনুমান সাত হাজারও এইসঙ্গে আসিল। ঘনশ্যাম রওনা হওয়ার সময় অনুমান কুড়িজন ঘোড়সওয়ার অন্যুন দুইশতজন এবং হিন্দুস্থানী তীরন্দাজ অনুমান সাত হাজার ও এইসঙ্গে আসিল। ঘনশ্যাম রওনা হওয়ার সময় অনুমান কুড়িজন ঘোড়সওয়ার মামুদ ছফির সঙ্গে দিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবকে পাহারার অধীনে আটক অবস্থায় বাসায় রাখিয়া আসিলেন। ঘনশ্যাম রাজা হইবার জন্য রওনা হইয়া আসিবার সময়ে কোমরের দুই ধারে দুইটি তরোয়াল ও জামিয়ার; পিঠে একটি ঢাল, তীর, ধনুক, ছোকর এবং হাতে একটি বঁড়শি লইয়াছিলেন। একটি তুর্কী ঘোড়াতে চড়িয়া লোকলস্কর সঙ্গে লইয়া গোমতী নদী অতিক্রম করিয়া এপাড়ে আসিলেন। ঘনশ্যাম সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে শুনিয়া রাজা অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এদিকে ঘনশ্যাম ঠাকুর সোনারদুয়ারী ঘরের নিকট আসিলেন। সেই সময়ে ঘনশ্যামের লোক তাহার নিশান লইয়া গিয়া সিংহাসন ঘরের সম্মুখে গাড়িল। তখন রাজার সেবক দুর্লভ নারাণ বলিল, "দেখ, বড়ঠাকুরের নিশান আনিয়া মহারাজার সিংহাসনঘরের সম্মুখে গাড়িয়াছে!

পূর্ব্বে কখনও এরূপ নিয়ম ছিল না।" তখন রাজা বলিলেন—"ইহাত বড়ই অন্যায় কথা হইল। এখন কি করা যাইবে? যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ইহাদের সহিত আছে কি?" তখন দুর্লভ নারাণ বিলল, "তাহাদের দুইজনকে দেখি নাই।" এমন সময় ঘনশ্যামের প্রেরিত এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে নবনিযুক্ত পীতাম্বর হাজারি অনুমান কুড়ি জন হিন্দুস্থানী সঙ্গে লইয়া সিংহাসনঘরে উঠিয়া রাজাকে বলিল, "তুমি সিংহাসন হইতে নামিয়া আস। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজা হইয়াছে।" তখন রাজা বলিলেন, 'ঘনশ্যাম আমার ভাই হয়, সে কেন এরূপ অধর্ম্মের কাজ করিবে? তোমরা কেন এরূপ অন্যায় কথা বলিতেছ?" তখন পীতাম্বর হাজারি রাজার হাত ধরিয়া তাহাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিল। সেই সময়ে রাজা বলিলেন—"আমি রাজা, আমার পা মাটি স্পর্শ করিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে।" তারপর তাহারা ঘনশ্যামের ব্যবহারের একখানা পালকি আনিয়া উহাতে রাজাকে উঠাইয়া ঘনশ্যামের বাড়িতে লইয়া গেল। রাজাকে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ অন্তঃপুরে থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজার সেবকেরাও রাজার সঙ্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

—০—

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ত্রিপুরার সিংহাসনে ঘনশ্যাম বা মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা

তারপর ঘনশ্যাম আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজা হইলেন। এইরূপে ১৬৩৪ শকাব্দ-বৈশাখ মাস - ২৯ তারিখ-সোমবার-ত্রয়োদশী তিথিতে একদন্ড বেলা থাকিতে ঘনশ্যাম রাজা হইলেন। চোন্তাই দৈবজ্ঞকে আনাইয়া ঘনশ্যাম মহেন্দ্র মাণিক্য নাম লইলেন। ব্রাহ্মণেরা দূর্বা ছিটাইয়া মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনবার তোপ দাগান হইল এবং অন্যান্য অনেক রকমের বাদ্য বাজান হইল। তারপর রত্ন মাণিক্য রাজার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য লোকদিগকে রত্নমাণিক্যের নিকট লইয়া যাওয়া হইল এবং ঘনশ্যামের পরিবারবর্গকে রাজবাড়িতে আনা হইল। মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা রত্নমাণিক্যের খাওয়ার ও শোয়ার এবং প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় আয়োজনপত্র পূর্ব্বের মতই দিলেন। রত্নমাণিক্যের পরিবারের স্ত্রীলোকদের জন্যও পূর্ব্বের মতনই খাওয়া থাকার যোগান দেওয়াইলেন। মহেন্দ্রমাণিক্য রাজা নগরে পাহারা বসাইয়া সাবধানে থাকিতে লাগিলেন। কোতোয়াল॰ নগরে ঢোল দিয়া সকলকে জানাইয়া বলিলেন যে রত্নমাণিক্য রাজাকে সরাইয়া দিয়া মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়াছেন এবং এবিষয়ে দেশের লোকজন যেন মনে কোন সন্দেহ না রাখে।

পর দিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা মামুদ ছফিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "চন্দ্রমণি ঠাকুরকে যুবরাজ নিযুক্ত করা হউক এবং কোতোয়াল মুছিব ও যুবরাজকে বধ করা যাক।" ইহাতে মামুদ ছফি বলিলেন, "যুবরাজকে মারিলে মীরমুরাদ রাগ করিবেন। তাহাছাড়া যুবরাজ তোমার বড়ভাই হয়। তাহাকে বধ করিলে লোকের নিকটে তোমার দুর্ণাম থাকিয়া যাইবে। যুবরাজ আসলে ভাল মানুষ। সে পূর্ব্বে যেমন রত্নমাণিক্যকে আরাধনা করিত তোমাকেও সেইরূপ করিবে। তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় যুবরাজের চাকরিতে থাকিতে দেও। যুবরাজের জন্য কোন ও সন্দেহ করিও না। আর কোতোয়াল মুছিবকে প্রাণে বধ করিলে কি লাভ হইবে? তাহার নিকট তোমার ভগ্নী ও বিবাহ দিয়াছ। তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করিলেইত ভাল হয় বলিয়া মনে করি; তথাপি তোমার মনে যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর।" তখন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা বলিলেন, "কোতোয়াল মুছিবের কারণে অতীতে অনেক অশান্তি ভোগ করিয়াছি, তাহাকে বধ করা হইবে আর তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া যুবরাজকে তাহার চাকরিতে থাকিতে দেওয়া হইবে।" মামুদ ছফি বলিলেন, "তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর।" মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, "তুমি গিয়া যুবরাজকে দশজন ঘোড়সওয়ার দিয়া পাহারা দিয়া তাহার বাড়িতে এবং কোতোয়াল মুছিবকে

শিকলপরা অবস্থায় আমার এখানে পাঠাইয়া দিবা।" তারপর মামুদ ছফি নিজের বাসায় আসিয়া কোতোয়াল মুছিবকে শিকলপরা অবস্থায় মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট এবং যুবরাজকে দশটি ঘোড়সওয়ার পাহারা দিয়া ও তাহাকে অনেক ভরসা দিয়া তাহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। পরে রত্নমাণিক্য রাজাকে মহেন্দ্র মাণিক্য পূর্ব্বে যে বাড়িতে থাকিতেন সেই বাড়ীর ভিতরে নিয়া গিয়া পাহারা দিয়া রাখা হইল। সেখানে রত্নমাণিক্য রাজা একবেলা নিরামিষ খাইয়া ইষ্টদেবতার আরাধনা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে পীতাম্বর হাজারি যে হাত দিয়া রাজার হাতে ধরিয়া রাজাকে লইয়া গিয়াছিল রাত্রিতে তাহার সেই হাত ফুলিয়া জ্বর হইয়া তিন দিনের মাথায় মারা গেল। মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়া চারিদিন গত হইলে নিজ নামে মোহর গড়াইলেন এবং সেইদিন কোতোয়াল মুছিবকে কাটিলেন।

কোতোয়াল মুছিবের স্ত্রী অর্থাৎ রত্নমাণিক্য রাজার ভগ্নী তাহার স্বামীকে কাটিয়াছে শুনিয়া সহমরণ কামনা করিয়া মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি সহমরণে যাইতে চাই, মহারাজের আদেশ প্রার্থী"। মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, "তুমি রত্নমাণিক্য রাজার ভগ্নী এবং আমারও ভগ্নী হও। তুমি সহমরণে যাইবে কেন?" তখন রাজার ভগ্নী বলিলেন, "স্বামীর অভাবে আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমাকে আর বাধা দিও না।" তারপর রাজা মহেন্দ্র মাণিক্য একশত টাকার রূপার আধুলি, সিকি, দোআনি, আনি ও আধআনি এবং কাপড় একজোড়া দিয়া বিদায় দিয়া বলিলেন, "ভাল কথা, তোমার সহমরণে যাওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকিলে যাও।" তখন রাজার ভগ্নী বলিলেন, "যদি মহারাজ অনুমতি দেন তবে ইহজন্মের মত রত্নমাণিক্য দাদাকে একবার দেখিয়া যাইতে চাই।" মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, "বেশ, তাহাকে দেখিয়া যাও।" তারপর রাজার ভগ্নী রত্নমাণিক্যের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "গোঁসাই মহারাজ, আমার স্বামীকে মহেন্দ্র মাণিক্য কাটিয়াছে। আমি সহমরণে যাওয়ার জন্য আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।" তখন রত্নমাণিক্য বলিলেন, "তুমি রামমাণিক্য রাজার কন্যা এবং আমারও ভগ্নী, তোমার এরূপ ধর্ম্মকার্য্যে মতি হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। তুমি যদি তোমার স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইতে পার তবে তোমার স্বামীর কুল এবং পিতার কুল উভয়ই উদ্ধার হইবে। এই কথা সত্য জানিয়া সকলের মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সহমৃতা হও। তোমার পশ্চাতে আমাকেও মহামায় পাঠাইতেছেন।" এই কথা বলিয়া রত্নমাণিক্য ভগ্নীকে বিদায় দিলেন। রত্নমাণিক্যের ভগ্নী তাহার স্বামীর মৃতদেহ মাচায় করিয়া এবং নিজেও তাহাতে উঠিয়া গোমতী নদীর পাড়ে গেলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য চিতা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণও পাঠাইয়া দিলেন। রত্নমাণিক্যের ভগ্নী স্নান করিয়া উঠিয়া রাজার দেওয়া আধুলি, সিকি, দোআনি, একআনি ও আধআনি উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তাহার গায়ে যে সমস্ত অলঙ্কার ছিল তাহাও বিতরণ করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণেরা নিয়ম মতে দাহ করাইল। তারপর রাজা কোতোয়াল মুছিবের সমস্ত জিনিসপত্র হিসাব করিয়া নিজে লইলেন।

—০—

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

রাজার ঘরে আগুন লাগিল

সেই দিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা আমাদিগকে দরবারে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য দুইটি ঘোড়া পাঠাইয়া আমাদিগকে নেওয়াইলেন। দোল মণ্ডপে আমাদের বসিবার জায়গা দেওয়া হইল। সেই দিন নূতন নিযুক্ত ও বাংলা দেশ হইতে আগত এবং দেশের লোক মিলাইয়া প্রায় আঠার হাজার লোক জমা হইয়াছিল। তারপর রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ সোনারদুয়ারী ঘরের মাথায় আগুন লাগিল। রাজা ঐ আগুন নিবাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা সেই আগুন নিবাইতে পারিল না।

তারপর রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে চৌচালা ঘরে বসিলেন। সেইদিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজার পরনে ছিল সোনালী কাজকরা গুজরাটী তসরের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা, রুপালী গোছপেছ, সোনালী পটুকা এবং কিংখাবের তৈরী ইজার। সাদা শাল একখানা তাহার কাঁধের উপর রাখা ছিল। পাগড়ির উপরে সোনার তরোয়াল দুইটি এবং হীরাখচিত কলগা দুইটি গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং মুক্তার মালা দুইপেঁচ পাগড়ির উপরে পরিয়াছিলেন। কানে মুক্তা, গলায় হীরা ও অন্য পাথরখচিত কণ্ঠাবরণ এবং দুগ্‌দুগীর সহিত মুক্তার মালা দুইপেঁচ গলা হইতে নাবি পর্য্যন্ত ঝুল দিয়া পরিয়াছিলেন। বাহুতে পাথরখচিত বাজুবন্ধ, কোমরে সোনার হাতলযুক্ত খঞ্জর একটি এবং পিঠে সোনারচোখ বসান ঢাল একটি লইয়াছিলেন। সোনার হাতলযুক্ত তরোয়াল একটি খাপ হইতে খুলিয়া লইয়া সাবধানে হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন।

সেই আগুন গিয়া রাজা যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরে লাগিল। রাজার ঘরে আগুন লাগিবার কথা শুনিয়া মামুদ ছফি একটি তুর্কীঘোড়ায় চড়িয়া তিনজন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি সেই আগুনের কিনারা দিয়া আসিয়া রত্নমাণিক্য যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে আসিলেন এবং রত্নমাণিক্যকে বলিলেন, "মহারাজা, তুমি ঘরের ভিতরে বসিয়া আছ কেন? রাজার ঘরে আগুন লাগিয়াছে; সেই আগুনে তুমি যে ঘরে আছ তাহা পুড়িবে। তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস। তোমার জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি।" রত্নমাণিক্য বলিলেন, "মীর্জা, আমরা সেই ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়াই তাহাতে আগুন লাগিয়াছে। আমরা যে ঘরে আছি তাহাতে আগুন আসিতে

পারে না, ইহাতে তুমি একটুও সন্দেহ করিও না।" তখন মামুদ ছফি বলিলেন, "আগুনের বিশ্বাস কি আছে? তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস।" তখন একটি পালকিতে তুলিয়া রত্নমাণিক্যকে বট-গাছের তলে লইয়া যাওয়া হইল। তখন মামুদ ছফি রত্নমাণিক্যকে বলিলেন, "তোমার পরিবারবর্গের লোকদেরও এখানে নিয়া আসা হউক।" রত্নমাণিক্য বলিলেন, "তাহাদিগকে আনাইবার প্রয়োজন নাই। তাহারা যে ঘরে আছে তাহাতে আগুন লাগিবে না তুমি আমার এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাইবা।" রত্নমাণিক্য মামুদ ছফিকে আরও বলিলেন, "যতদিন আমার রাজ্য ভোগ ছিল তাহা করিয়াছি। আমি আর রাজা হইতে চাহি না। আমাকে দুইজন ব্রাহ্মণ দিলেই হয়। আমি ভাগবত, তন্ত্র আর পুরাণ শুনিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় দিন কাটাইব। আমি পরলোকে মঙ্গল চাই। মীর্জা, তুমি ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আমার জন্য এইটুকু করিয়া দেও।" তখন মামুদ ছফি বলিলেন, "ভাল কথা, আমি রাজাকে এই কথা বলিব। মহারাজ, এবিষয়ে তুমি আমার উপরে নির্ভর করিতে পার।"

সেই আগুনে রাজার সকল ঘর পুড়িল। রাজভাণ্ডারে যাহা কিছু জিনিসপত্র ছিল সেগুলিও পুড়িয়া গেল। সেই সময় প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছিল। জিনিসপত্র কিছুই রক্ষা করিতে পারা গেল না। তখন আমাদিগকে আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেদিন আমাদিগকে দরবারে উঠান হইল না। যে ঘরে রত্নমাণিক্যকে রাখা হইয়াছিল সেই ঘরটি পুড়িল না। পরে মামুদ ছফি রত্নমাণিক্যকে তাহার ঘরে রাখিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে মহেন্দ্র মাণিক্য তাম্বুকানাতের ঘর বানাইয়া তাহাতে বাস করিলেন। রাজার সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া যুবরাজ খাওয়ার এবং শুইবার যাবতীয় জিনিসপত্র রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রাজ অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণের জন্যও প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস যুবরাজ পাঠাইলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুরও রাজার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন।

—০—

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

গঙ্গানারাণী ধাই রত্নমাণিক্যকে বধ করিবার জন্য ঘনশ্যামকে পরামর্শ দিল

চন্দ্রমণি ঠাকুরের ধাই গঙ্গানারাণী নামে এক স্ত্রী ছিল। বড়ঠাকুর তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। বড় ঠাকুর রাজা হইলে পর গঙ্গানারাণীকে সঙ্গে করিয়া রাজবাড়িতে আনিয়াছিলেন। এই ঘটনার দিন রাত্রিতে গঙ্গানারাণী মহেন্দ্র মাণিক্য রাজাকে বলিল, 'মহারাজ, তোমার মনে অনেক কষ্ট হইলেও হইতে পারে। দিনের দুই প্রহর বেলায় সোনার দুয়ারী উঁচু ঘরের মাথায় আগুন লাগিয়া তোমার সম্মুখে তোমার পূর্ব্বপুরুষ রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া গেল। মনে হয় এই আগুন অদ্ভুত এবং মানুষের সৃষ্ট নয়। তাহাছাড়া রত্নমাণিক্য রাজ্যচ্যুত হওয়ায় দেশের লোকজন বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। রত্নমাণিক্য বাঁচিয়া থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই কথা জানিয়া রত্নমাণিক্যকে আর বাঁচিতে দেওয়া উচিত হয় না।" তখন মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, "ভাল কথা বলিয়াছ, মামুদ ছফি একথা শুনিলে না জানি কি বলে?" গঙ্গানারাণীধাই বলিল, "এখন তুমি রাজা হইয়াছ। বুদ্ধি স্থির করিয়া তোমাকে কাজ করিতে হইবে। কেহ তোমার অমঙ্গলজনক কোন কথা বলিলে তাহা তুমি রক্ষা করিবে কেন? এখন তুমি চন্দ্রমণি ঠাকুরকে আনাইয়া বড়ঠাকুরের পদ দেও, মামুদ ছফির কথামত যুবরাজের প্রতি রাগ বিসর্জন দিয়া তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার করিয়া লও, পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী ও অন্যান্য সকলকে তোমার বশীভূত কর এবং এই পরামর্শ মুরাদবেগকে গ্রহণ করাও।" তখন মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, "তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ।"

—০—

ত্রিংশ অধ্যায়

রত্নমাণিক্য রাজা বধ

পরের দিন মহেন্দ্র মাণিক্য মুরাদবেগকে আনাইয়া উক্তরূপে পরামর্শ করিলেন। মুরাদ্‌বেগ বলিল, "মহারাজ ভাল বুদ্ধিই স্থির করিয়াছেন; মামুদ ছফিকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইবে।" রাজা বলিলেন, "আমার সকল কাজ তোর সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে; তোর চেয়ে অধিক স্নেহের লোক আমার আর নাই। তুই নিজে গিয়া মামুদ ছফির কাছে আমার এই কথা বল।" এই কথা বলিয়া মুরাদ বেগকে বিদায় দিলেন। ইহার পরে মুরাদ্‌বেগ্ মামুদ ছফির নিকট গিয়া এই সমস্ত কথা বলিল। মামুদ ছফি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি আমার পূর্ব্বের অঙ্গীকার অনুযায়ী তাহাকে রাজা করিয়াছি। এখন রত্নমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য মহেন্দ্র মাণিক্য আমাকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহাতে আমি পরামর্শ দিতে পারিব না। আমার কাছে রত্নমাণিক্য বলিয়াছে যে, সে আর রাজা হইতে চাহে না। দুইজন ব্রাহ্মণ পাইলে তাহাদের কাছে ভাগবত— পুরাণ শুনিয়া দিন কাটাইতে চাহে। এখন রত্নমাণিক্যকে বধ করিলে রাজ বধের পাপ হইবে। লোক সমাজেও দুর্ণাম থাকিয়া যাইবে। আমি কিরূপে তাহাকে বধ করিতে বলিব? অন্য বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে সেগুলি করিলে ভালই হয়।" এইকথা বলিয়া মামুদ ছফি মুরাদ্‌বেগকে পাঠাইয়া দিলেন। মুরাদ্‌বেগ্ আসিয়া মহেন্দ্র মাণিক্যকে এই সকল কথা জানাইল। মহেন্দ্র মাণিক্য মামুদ ছফির মত শুনিয়া মুরাদ্‌বেগকে বলিলেন, "এখন কি করা যায়? রত্নমাণিক্যকে বধ করিতে মামুদ ছফি নিষেধ করিতেছে, অথচ না করিলেও অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। পূর্ব্বে গোবিন্দ মাণিক্যকে সরাইয়া দিয়া ছত্রমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন। তখন গোবিন্দ মাণিক্য পলাতক অবস্থায় ছিলেন। পরে আবার গোবিন্দ মাণিক্য ছত্রমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন; এখন রত্নমাণিক্য বাঁচিয়া থাকিলে আমারও সেইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।" তখন মুরাদ্‌বেগ্ বলিল, "মহারাজ ভালই চিন্তা করিয়াছেন। রত্ন মাণিক্যের উপরে দেশের সমস্ত লোকজনের বড়ই অনুরাগ আছে। মামুদ ছফি ঢাকায় চলিয়া গেলে দেশের লোকজন রত্নমাণিক্যকে রাজা করিবে এবং আপনাকে বধ করিবে। এই কথা নিশ্চয় জানা অবস্থায় রত্নমাণিক্যকে বধ করাই ভাল।" মহেন্দ্র মাণিক্য রত্নমাণিক্যকে বধ করাই স্থির করিলেন। মুরাদ্‌বেগ্ নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিল।

পরের দিন রাজা যুবরাজকে আনাইলেন। দেশের বড় বড় এবং ভাল লোকেরা সকলে দরবারে আসিলেন। রাজা অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের সম্মুখের চৌচালা ঘরে বিছানা করিয়া বসিলেন। তখন যুবরাজ আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা যুবরাজকে বলিলেন, "তুমি রত্নমাণিক্যের বড়ভাই এবং আমারও বড়ভাই হও। পূর্ব্বে যেরূপ রত্নমাণিক্যের মঙ্গলকামনা করিয়া যুবরাজের কাজ করিতেছিলা এখন আমার মঙ্গলকামনা করিয়া সেই কাজ করিতে থাক।" যুবরাজ বলিলেন, "আমি মহারাজের আদেশের চাকর, মহারাজ যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।" অন্যান্য বড় লোকদিগকে রাজা বলিলেন, "ঈশ্বর যার জন্য যে ভোগের ব্যবস্থা করেন সে তাহাই পায়। পূর্ব্বে তোমরা যে ভাবে ছিলা এখন আমার মঙ্গলকামনা করিয়া সেই ভাবে থাকিবা।" তখন তাহারা বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, মহারাজ যে আদেশ করিবেন আমরা তাহাই পালন করিব।" রাজা তখন চন্দ্রমণি ঠাকুরকে বড়ঠাকুরের পদ দিলেন এবং যুবরাজের সঙ্গের পাহারা উঠাইয়া দিলেন। তারপর রাজা সভাত্যাগ করিলেন এবং অন্যান্যেরাও নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া গেল। রাজা অন্দরে গিয়া মামুদ ছফিকে বলিয়া পাঠাইলেন, "রত্নমাণিক্যকে বধ না করিলে ভাল হইবে না। এ বিষয়ে মীর্জা (মামুদ ছফি) যেন কিছু না বলে।" এই কথা শুনিয়া মামুদ ছফি বলিলেন, "আমার যাহা বলিবার তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল তোমার। আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি?" সেই দিন রাত্রি অনুমান এক প্রহর থাকিতে মহেন্দ্র মাণিক্য রত্নমাণিক্যকে মারিবার জন্য বাঙ্গালা দেশ হইতে নূতন নিযুক্ত রাজপুত কীর্ত্তি সিংহ হাজারিকে চারিজন হিন্দুস্থানী সঙ্গে দিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, "তুই গিয়া রত্নমাণিক্যকে বধ কর।তোর পদ বড় করিয়া দিয়া তোকে আমি সসম্মানে সঙ্গে করিয়া চিরকাল রাখিব।" তখন কীর্ত্তি সিংহ বলিল, "আমি মহারাজের নুন খাইয়াছি, মহারাজ যে আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।" কীর্ত্তি সিংহ চারিজন হিন্দুস্থানী সঙ্গে লইয়া রত্নমাণিক্য যে জায়গায় ছিলেন সেখানে গেল। সেই সময়ে রত্নমাণিক্য ঘুমাইতেছিলেন। যে সব লোক রত্নমাণিক্যকে পাহারা দিতেছিল কীর্ত্তি সিংহ তাহাদিগকে দিয়া রত্নমাণিক্যকে খবর দেওয়াইল। সেই প্রহরীরা গিয়া রত্নমাণিক্যকে জাগাইয়া বলিল, "মহারাজ উঠ, রাজার নিকট হইতে লোক আসিয়াছে।" রত্নমাণিক্য ঘুম হইতে জাগিয়া তাঁহার পত্নীগণকে বলিলেন, "তোমরা কি দেখিতেছ, এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে।' তখন রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রত্নমাণিক্য তাঁহার পত্নীগণকে বলিলেন, "তোমরা কেন ব্যাকুল হও? এখন প্রস্তুত হইয়া পরলোকের উপায় চিন্তা করা উচিত।"

কীর্ত্তি সিংহ হাজারি রত্নমাণিক্যের নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ, তুমি প্রস্তুত হও। তোমাকে বধ করিবার জন্য রাজা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" তখন রত্নমাণিক্য বলিলেন, "আমাকে সরাইয়া দিয়া ভাই ঘনশ্যাম রাজা হইল; এখন আমাকে এক সের চাউল দিলে তাহা খাইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া ইষ্টদেবতার সেবা করিয়া দিনপাত করিতে পারি। বিনা অপরাধে আমাকে মারিয়া রাজবধের পাপ করিলে তাহার কি লাভ হইবে? তাহাছাড়া তুই একজন রাজপুত। তুই হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে জানিস। তোরা যদি অন্যায় ভাবে আমাকে বধ করিস তবে ধর্ম্ম তোদের নষ্ট করিবে।" এই কথার

কীর্ত্তি সিংহের মনে ধর্ম্মভয় জাগরুক হইল। সে রত্নমাণিক্যকে না মারিয়া ফিরিয়া গিয়া মহেন্দ্র মাণিক্যকে বলিল, "মহারাজ, আমি রত্নমাণিক্যকে বধ করিতে পারিব না। যদি আমাকে চাকরিতে রাখিতে ভাল মনে করেন তবে রাখুন নতুবা বিদায় দিন, তবু আমি রত্নমাণিক্যকে বধ করিতে পারিব না।"

তখন মহেন্দ্র মাণিক্য কীর্ত্তি সিংহ হাজারিকে তাহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বিশ্বাসী ও অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে সঙ্গে সঙ্গে ছিল এরূপ চারিজন লোক রত্নমাণিক্যকে মারিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেই লোকেরা গিয়া রত্নমাণিক্যকে বলিল, "মহারাজ, তোমাকে বধ করিবার জন্য রাজা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি প্রস্তুত হও!" তখন রত্নমাণিক্য বলিলেন, "কীর্ত্তি সিংহ এই কাজ অন্যায় মনে করিয়া আমাকে বধ না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবু তোমরা যখন আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ, বেশ, আমি প্রস্তুত হই।" এই কথা বলিয়া রত্নমাণিক্য স্নান করিয়া কাপড় পরিলেন এবং নিজের পত্নীগণকে বলিলেন, "তোমরা অস্থির হইও না। পরলোকের উপায় চিন্তা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।" তারপর সেই চারিজন লোক রত্নমাণিক্যকে ধরিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিল।

—o—

একত্রিংশ অধ্যায়

রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ সৎকার

রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ তাঁহার মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্বরের নাম-গান করিতে লাগিলেন। রত্নমাণিক্যকে বধ করিয়া সেই চারিজন লোক গিয়া এই খবর মহেন্দ্র মাণিক্যকে জানাইল। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা যুবরাজ, চন্দ্রমণি বড়ঠাকুর ও অন্যান্য বড় বড় লোকদিগকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং ব্রাহ্মণও আনাইলেন। রাজা তাহাদের সকলকে বলিলেন, "রত্নমাণিক্যের মৃত্যু হইয়াছে এখন তাঁহাকে দাহ করিবার ব্যবস্থা কর।" তারপর গোমতী নদীতীরে মুক্তিঘাটে রত্নমাণিক্যের জন্য চিতা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

রাজা রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ আনিবার জন্য যুবরাজ, চন্দ্রমণি বড়ঠাকুর, অন্যান্য বড়লোক এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে পাঠাইলেন। তাহারা গিয়া রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ দেখিয়া অনেক কান্নাকাটি করিলেন। যুবরাজ রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুরও রত্নমাণিক্যের শবের পায়ে পড়িয়া "আজ আমার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে।" বলিয়া কাঁদিলেন। এইরূপে যুবরাজ ও চন্দ্রমণি ঠাকুর বিলাপ করিয়া কান্নাকাটি করিলেন।

তখন রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ বলিলেন, "এখন তোমরা অস্থির হইলে লাভ কি? তোমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে এখন আমাদের সদ্‌গতি যাহাতে হয় তাহার উপায় চিন্তা কর।" তারপর সকলে প্রস্তুত হইয়া রত্নমাণিক্যের শব খাটে তুলিয়া লইলেন। সেই খাটে রত্নমাণিক্যের মহিষী বসিয়া শবের উপরে চামর দোলাইতে লাগিলেন। মৃত রাজার অন্যান্য পত্নীগণকে ভিন্ন ভিন্ন দোলায় উঠাইয়া শবের দুই দিকে লইয়া যাওয়া হইল। তাহারা দোলায় উঠিয়া ঈশ্বরের নাম গান করিতেছিলেন এবং আধুলি, সিকি, আনি, দুআনি এবং আধআনি বিলাইতেছিলেন এবং খৈ, ফুল ইত্যাদি ছিটাইয়া দিতেছিলেন। শবের সম্মুখে ব্রাহ্মণগণ শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া যাইতেছিল। বাদ্যকরেরা বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল, হাতী-ঘোড়াও সঙ্গে গিয়াছিল। যুবরাজ প্রভৃতি তালেবর লোকেরা খালিপায়ে মৃতের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিলেন। রত্নমাণিক্যকে বধকরা হইয়াছে শুনিয়া নগরের সকল স্ত্রী-পুরুষেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবের সঙ্গে চিতার জায়গায় যাইতেছিল। শবের সঙ্গে যুবরাজ প্রভৃতি যে সমস্ত বড় বড় লোক গিয়াছিলেন

তাহারাও করুণসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিলেন। যাহারা ঘরে রহিল তাহারাও কাঁদিতেছিল। মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা ও রত্নমাণিক্যের শব দাহ করিতে লইয়া যাওয়ার সময়ে ক্রন্দন করিয়া রাজবাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন। সেই দিন উদয়পুর নগরে ক্রন্দনের ঢেউ বহিয়া গেল।

রত্নমাণিক্যকে দাহ করিতে নেওয়া হইলে পরে রত্নমাণিক্যের বিমাতা চন্দ্রমণি ঠাকুরের মা কান্নাকাটি করিয়া ইহজন্মের মত রত্নমাণিক্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আসি' বলিয়া চিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি রত্নমাণিক্যের শব জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার স্বামী রামমাণিক্য রাজা আমাকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন তুমিও সেইরূপে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ; আমার পুত্র চন্দ্রমণি যেরূপ আমার সেবা করিয়াছে তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" এই কথা বলিয়া বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ একে একে তাহাদের শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন। শাশুড়ী ও বধূগণকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমরা ভাগ্যবতী, স্বামীর সঙ্গে যাও।" তারপর যুবরাজ ও চন্দ্রমণি ঠাকুর তাহাদের মাকে প্রবোধ দিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

সেই সময়ে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা এক হাজার টাকার রূপার আধুলি, সিকি, দুআনি, আনি ও আধআনি লোক দিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। রত্নমাণিক্যের শবটিকে স্নান করান হইল; তাঁহার পত্নীগণও স্নান করিলেন। তাহারা রাজার দেওয়া ঐ অর্থ ও নিজেদের গায়ের অলঙ্কার ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা নিয়মিতরূপে ঐ শব দাহ করাইল। চন্দ্রমণি ঠাকুর ধড়া লইলেন। তারপর সৎকার শেষ করিয়া যুবরাজ ও চন্দ্রমণি বড়ঠাকুর মৃতের অস্থি লইয়া ক্রন্দন করিয়া বাড়িতে ফিরিলেন। অন্যান্য মান্যগণ্য লোকেরা ও নগরের সকল লোকজন ক্রন্দন করিয়া নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। পরে রাজা রত্নমাণিক্যের চিতার উপরে ইটের মঠ তৈরী করাইয়া দিলেন। পূর্ব্বের রাজাদিগকেও ঐ মুক্তিঘাটে দাহ করা হইত এবং তাঁহাদের চিতার উপরে ইটের তৈরী মঠ দেওয়া আছে। দশদিন গত হইলে চন্দ্রমণি ঠাকুর রত্নমাণিক্যের পিণ্ড দিলেন।

একমাস গত হইলে রাজা রত্নমাণিক্যের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করাইলেন; দান-দক্ষিণাও বিস্তর করিলেন। পরে রাজবংশীয় হরিধন ঠাকুরের পুত্রকে পাঠাইয়া এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া রত্নমাণিক্যের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন করাইলেন। এক বৎসর অতীত হইলে এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গয়া তীর্থে রত্নমাণিক্যের পিণ্ড দেওয়াইলেন। পরে মহেন্দ্র মাণিক্য রত্নমাণিক্যকে বধ করার জন্য ডম্বরু তীর্থে স্নান করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অনেক করিয়া দান-দক্ষিণা করিলেন; এবং জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ভোগ দেওয়াইলেন।

—০—

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মামুদ ছফির বিদায়

এদিকে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা ঐ পোড়া ঘরগুলি হইতে সোনা-রূপা ও অন্যান্য জিনিস যাহা সম্ভব লইলেন। তালাস করিয়া রাজা পঁচিশ লক্ষ টাকার সোনা ও রূপা উভয়ে মিলিয়া পাইলেন। রাজা মামুদ ছফিকে দিলেন দশ হাজার টাকা ও দুইটি হাতী। মামুদ ছফির ছেলেকে দিলেন এক হাজার টাকা ও একটি হাতী এবং মীর মামুদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। ঐ টাকা ও জিনিস দিয়া মামুদ ছফিকে বিদায় দিলেন। যুবরাজ ও মামুদ ছফিকে দশ হাজার টাকা দিলেন। তারপর রাজা বাংলা দেশ হইতে নূতন নিযুক্ত লোকদিগের মধ্যে কিছু সংখ্যক চাকরিতে রাখিয়া অবশিষ্টদের বেতনের টাকা দিয়া বিদায় দিলেন।

—০—

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

রংপুরে রাজসভায় মহেন্দ্র মাণিক্যের দূত

তারপর শ্রাবণ মাসের দশদিন গত হইলে পূর্ব্বের নিয়মে আমাদিগকে ত্রিপুরার রাজদরবারে সংবর্দ্ধনা করা হইল। পূর্ব্বের নিয়মে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ফুলচন্দন দিয়া আমাদিগকে আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্বের নিয়মে আমাদের খাওয়াদাওয়ার জিনিসপত্রও দেওয়া হইল। পরে মাঘ মাসের সাতদিন গত হইলে পূর্ব্বের মত দরবার করিয়া আমাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। আমাদের প্রত্যেককে দিলেন আতলঞ্চের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা এবং রুপার ঝালর দেওয়া পটুকা। আমাদের দুইজনকে ও আমাদের পাইকদিগকে একত্রে দিলেন [illegible] টাকা।

রাজা ত্রিপুরার দূত অরিভীম নারাণকে পত্র ও উপঢৌকন দিয়া আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। অরিভীম নারাণের সঙ্গে আমরা ১৬৩৫ শকাব্দের ভাদ্র মাসের তেরদিন গত হইলে রংপুরে পৌঁছিলাম। স্বর্গদেবের আদেশে বড়বড়ুয়া দিখৌ নদীর অপর পাড়ে জানখানায় একটি বাসা করাইয়া দিলেন এবং সেই বাসায় অরিভীম নারাণ থাকিতে লাগিলেন। তাহার খাওয়াদাওয়ার আয়োজন পূর্ব্বের নিয়মে দেওয়া হইল।

পরে কার্ত্তিক মাসের বারদিন গত হইলে সপ্তমী তিথিতে শেষ বেলায় পূর্ব্বের নিয়মে বড়বড়ুয়া নিজ দরবারে সংবর্দ্ধনা করার জন্য অরিভীমকে আনাইলেন। ত্রিপুরার সেই দূত ও পূর্ব্বের দূতদের ন্যায় বড়বড়ুয়ার ঘরে বসিলেন। তখন বড়বড়ুয়া প্রশ্ন করিলেন, "অরিভীম নারাণ, তুমি যখন রওনা হও তখন তোমার রাজা মহেন্দ্র মাণিক্য কুশলে ছিলেন ত? অরিভীম বলিলেন, "স্বর্গদেব, আমি যখন রওনা হই তখন আমাদের রাজা কুশলে ছিলেন।" বড়বড়ুয়া বলিলেন, "তোমাদের রাজা কুশলে থাকুন আমারও ইহাই ইচ্ছা।" ত্রিপুরার দূত তখন পত্র দিলেন, মজুমদার সেই পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঐ পত্রে লেখা ছিল ঃ—

স্বস্তি বিবিধ-গুণচয়-সমুদ্যোতিত-কলেবর-নানাদান প্রমোদীকৃত-মার্গাগণন-প্রতাপ-তপন-বিগলিত-রিপু-নিকরান্ধকার-শ্রীযুত-সুরত-সিংহ বড়ুয়া-বিমল-শীলেষু। প্রেমসম্পাদকো লেখঃ। বৃত্তান্ত এবঃ। শ্রীরত্নকন্দলী শ্রীঅর্জ্জুন বৈরাগি-প্রমুখাৎ ত্বদীয়াং সর্ব্বাং বৃত্তিং বিজ্ঞায় পরমানন্দযুতোহহম্। শ্রীযুতোরিভীম নারায়ণ-প্রণিধিরপি সর্ব্বমাবেদয়িষ্যতীতি। পত্রসন্দেশার্থমীষদবসু প্রহীয়তে, তদ্গ্রাহ্যম্। কিম্বহুনা, বাচনিকং তাবেব কথয়িষ্যতঃ। বেদরামর্তু-শীতাংশুগণিতে শকবৎসরে। মার্গ শুক্ল দ্বিতীয়াং পত্রী চৈষা প্রহীয়তে।।

তারপর বড়বড়ুয়া বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, রাজা মহেন্দ্র মাণিক্যের পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শোনা গেল। তিনি মুখে কি কথা বলিয়া দিয়াছেন?" দূত বলিলেন, "স্বর্গদেব, পত্রে যাহা লেখা আছে, মুখেও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।" পরে পূর্ব্বের নিয়মে ঐ দূতকে ফুল-চন্দন, ও পান সুপারি দেওয়া হইল। তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, এখন বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, যদি তোমার ভাগ্যে থাকে তবে স্বর্গমহারাজের সাক্ষাৎ পাইবা।" তারপর ত্রিপুরার দূতকে পূর্ব্বের মত বাসায় লইয়া আসা হইল। পরে বড়বড়ুয়া মাসিক ও রোজ হিসাবে দ্বিগুণ করিয়া ঐ দূতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পৌষ মাসের চব্বিশদিন গত হইলে পূর্ব্বের মত সভা করিয়া মহারাজ ত্রিপুরার দূতকে দরবারে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য আনাইলেন। দরজার সম্মুখ হইতে রত্নকন্দলীকে আনাইয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূতের নাম কি? দূতের বংশ কি? সে যে রাজার দূত সেই রাজার নাম কি?" রত্নকন্দলী বলিলেন, "দূতের নাম অরিভীম নারাণ, জাতিতে ত্রিপুরা, যে রাজার দূত তিনি-রত্নমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভাই, নাম মহেন্দ্র মাণিক্য।"

পরে ঐ দূতকে নিয়া পূর্ব্বের নিয়মে বড়চরার বিশিষ্ট জায়গায় বসান হইল। উপঢৌকনগুলি শরার উপরে রাখা হইল। তখন বড়বড়ুয়া পরিচয় দিয়া বলিলেন, "স্বর্গদেব, রত্নমাণিক্য লোকান্তরিত হওয়ায় রাজা মহেন্দ্র মাণিক্য স্বর্গদেবের সদিচ্ছা কামনা করিয়া পত্র ও উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া অরিভীম নারাণকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়াছেন। সেই দূতও মহারাজের চরণে প্রণাম করিতেছে।" তখন অরিভীম নারাণ প্রণাম করিলেন। রত্নকন্দলী পত্র নিয়া মজুমদারের হতে দিলেন। মজুমদার পত্রখানি পাঠ করিলেন। পরে বড়পাত্র গোঁহাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরিভীম নারাণ, স্বর্গমহারাজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি যখন আস তখন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা কুশলে ছিলেন ত?" দূত উত্তর করিলেন, "স্বর্গদেব, আমি যখন এখানে রওনা হই তখন তিনি কুশলে ছিলেন।" পরে বড়পাত্র বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, স্বর্গমহারাজ বলিতেছেন যে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা তাঁহার রাজ্য লইয়া কুশলে থাকিবেন ইহাই তিনি কামনা করেন।"

পত্রে লেখা ছিল ঃ—

স্বস্তি প্রবল বলাহকনিকায় প্রতিকাশ গন্ডস্থলা-বিরল বিগল-ম্মৈরেয়ধারা পুরিতাখণ্ড ভূমণ্ডল দন্তায়ল পটল সমুদয় প্রলয় প্রভঞ্জন প্রতিম জরাখর্ব্ব গন্ধর্ব্বগণখুরক্ষুন্ন ক্ষৌণীতলোচ্চালিত ধূলিপটল

মহোন্নতিপটিম সমুচ্ছ্রিত মার্ত্তণ্ডমণ্ডল তিরস্কার গরিমসমুচ্ছ্রায়িত বিবিধ বৈজয়ন্তীচয়.চারুচেলাবলী চিত্রিত বিহায়ঃস্থল পদাতি সংঘাত সমুদ্ভ্রামিত চামীকর শতচন্দ্রচর্মনিচয় চমৎকার সম্ভাবিত ত্রিলোকীতল সম্বর্ত্ত সময়ভ্রমভর নিজধ্বজিনী নায়কগণ সমর বিজয় সমুদ্যম সমীহ গোপুর নিঃ সরণ বৃত্তান্তাকলন ভয় বিকল তোজ্জিতালয় পারাবার-শতবিপ্রতীপ-ভূপালকুল-বামলোচনা-লোচনাবলী-বিগলিতাশ্রুধারা সমুৎপাদিতা পার-পারাবার, পরিস্ফুর্জৎপ্রতাপৌর্ব্ব-বৈশ্বানরজ্বালা-জালাবলীঢ় ত্রিভুবন-বিবর-বিসরেষু। কনক করি-তুরঙ্গমাদ্যকেবিধ-বিবিধ-বিধিবোধিত-বিতরণ-কৃতার্থী-কৃতার্থীসার্থ-গীয়মান-যশঃপ্রকাশী-কৃতাশামন্তলেষু, শ্রীশ্রীমৎ-স্বর্গদেব-রুদ্রসিংহ মহারাজ-পরম-পবিত্র-চরিত্রেষু। শ্রীশ্রীযুত মহেন্দ্র মাণিক্য-দেবস্য সবিনয়-নতিততি-সম্পাদয়িত্রী পত্রী বিজৃম্ভতে। শ্রীমদ্ভবদনুদিনো-পচীয়মান-ভব্যমব্যাহত-সভীপ্স ঃ সময়োচিত-নিজ ভাবুক-ভাবিতোহহম্। আবয়োঃ শ্রীপরমেশ্বরেণ কিং ন দত্তম্, তথাপি পত্রসন্দেষশার্থমীষদ্বসু প্রেষ্যতে শ্রীমদ্ভবৎ-প্রণিধিদ্বারা ত্বদীয়মঙ্গল প্রকাশাৎ সুহৃদভিনন্দকৈঃ ভবাদৃশৈর্ব্বয়মা-নন্দপাত্রী করিষ্যামহে। আলমতিবিস্তরেণ গিরাম্। শ্রীযুত রত্নকন্দলী শ্রীযুতার্জ্জুন বৈরাগি-প্রমুখাৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাতব্যমিতি। বেদাগ্নিরস-শুভ্রাংশুগণিতে শকহায়নে। মার্গ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং পত্রী চৈষা প্রহীয়তে। যুধিষ্ঠিরস্য সম্রাজো বিরাট দ্রুপদাবপি। দূরস্থৌ সময়ে তৌচ সৌহার্দ্দাদ্বিতকারিণৌ। অপরঞ্চ—কৈলাসেশ্বর-কুন্দ-কম্বু-করকা-কর্পূর-হারস্মিতা। জোৎস্নাধারণ-রাজহংস-কুমুদ-ক্ষীরোদনীর-দ্যুতিঃ। কীর্ত্তিস্তে সুরসুন্দরীমুখবিধু-জোৎস্নাবলীবাভিতো। মুদ্রামাতনুতে সুরেন্দ্র-নয়ন-স্তোমাম্বু জানা মিয়ম্। তারপর বড়পাত্র বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, স্বর্গ মহারাজ বলিতেছেন যে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা শোনা গেল, এখন মুখে কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা বল।" তখন ত্রিপুরার দূত উত্তর করিলেন, "স্বর্গদেব, পত্রে যাহা লেখা আছে মুখেও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।" বড়পাত্র বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, স্বর্গমহারাজ বলিতেছেন যে এখন তুমি বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর। মহেন্দ্র মাণিক্য পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার উত্তর তোমার যাওয়ার সময়ে দেওয়া হইবে।" পরে সেই দূত পূর্ব্বের নিয়মমত বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

১৬৩৫ শকাব্দের চৈত্র মাসের একুশ দিন গত হইলে পর ত্রিপুরার দূতকে পূর্ব্বের নিয়মে আবার দরবারে আনিয়া বিদায় দেওয়া হইল। তখন বড়পাত্র গোঁহাই বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, স্বর্গমহারাজ বলিতেছেন যে, আজ তোমাকে মহারাজ বিদায় দিলেন। মহেন্দ্র মাণিক্যের পত্রের জবাব স্বর্গ মহারাজের পত্রে দেওয়া আছে। স্বর্গ মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য রাজাকে জানাইতে বলিতেছেন যে স্বর্গমহারাজের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজার যে মিলন-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহা সকল লোকে জানাজানি হইয়াছে। এই সম্পর্কের খর্ব্বতা যাহাতে না ঘটে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজ যেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। মহেন্দ্র মাণিক্য যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতি সকলের তুলনা দিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কার্য্যকালে তিনি যেন স্বর্গ মহারাজের পক্ষে থাকেন।" পরে আবার বড়পাত্র গোঁহাই বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, তুমি আজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অন্য দিন নিজ দেশে যাইও।" তারপর অরিভীম পূর্ব্বের মত নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

—০—

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট দূতযোগে পত্র ও উপঢৌকন প্রেরণ

চৈত্র মাসের সাতাইশ দিন গত হইলে বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতকে বিদায় দিলেন। সেই সময়ে বড়বড়ুয়া বলিলেন, "অরিভীম নারাণ, তোমাকে স্বর্গদেব মহারাজা বিদায় দিয়াছেন, আজ আমিও বিদায় দিলাম। স্বর্গ মহারাজের সঙ্গে মহেন্দ্র মাণিক্যের যে প্রীতিকর সম্পর্কটি হইয়াছে তাহা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় সে চেষ্টা করিও।" তারপর অরিভীমকে ফুলচন্দন দিয়া বলিলেন, "আজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অন্যদিন নিজ দেশে রওনা হইও।" ত্রিপুরার দূত পূর্ব্বের মত বাসায় চলিয়া আসিলেন। স্বর্গদেবতা ত্রিপুরার দূতকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি দিয়াছিলেন—সোনার লঠা কানফুল একজোড়া, চিকণ আতলঞ্চের জামা একটি, রূপালী পটুকা একটি, রঙ্গিন পাগড়ি একটি, ফুল তোলা বড়কাপড় একটি, আতলঞ্চের ইজার একটি এবং টাকা ৬০। চারিজন দৈত্যসিংহকে দিলেন—মজা জামা চারিটি, রঙ্গিন পাগড়ি চারিটি, এক ভাঁজের বড়কাপড় চারিটি, গন্ধীয়াঘরীয়া পটুকা চারিটি এবং ঢেঁকেরী ঢরার ইজার চারিটি। ইহাদের প্রত্যেককে ত্রিশ টাকা করিয়া দিলেন এবং একজন চাকরকে ছয় টাকা দিলেন।

স্বর্গ মহারাজা মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

স্বস্তি শ্রীমদ্গৌরীনাথ-চরণারবিন্দ-স্যন্দ-মকরন্দ সন্দোহ-পানানন্দিত-স্বস্তি-মধুব্রত, বিবিধ-গুণোপার্জ্জিত-কীর্ত্তি-শুভাংশু-কিরণ-ধোরণী-ধবলীকৃতা-শেষ-ধরা-মণ্ডল নিজতেজস্তোম-খর্ব্বাকৃতারিত। প্রচয়োত্তুঙ্গ-তুরঙ্গ-বারণ চমুনিচয়-বিস্ফারিত-রণগরিমাগ্রগণ্য-গণনীয়বর, নিখিল-শাস্ত্রস্যা-শোদ্দীপ্ত-বাগজাল-পণ্ডিত-ব্যাপ্ত-গোষ্ঠ্যবচিত-মহেন্দ্রধাম, অশেষদানোদ্ধত-রব-ন্যবহৃত-কর্ণাবদাত-যশঃপটলেষু, শ্রীশ্রীমহেন্দ্র মাণিক্য-মহারাজ মহোগ্র-প্রতাপেষু। সম্মোদ-সম্পাদয়িত্রী পত্রী বিরাজতে। সমিহ শ্রীমতাং প্রীতি-পাত্রীভূতানাং ভবাদৃশামনিশং কুশলমীহে। ভবতাং শ্রীযুতারিভীম নারায়ণ দ্বারা ত্বদীয়ানন্দ প্রকাশাৎ ভবদ্বিজ্ঞাপ্তিমবগম্য সাহলাদিতঃ। প্রমোদার্হৈর্ভবাদৃশৈঃ সৌহার্দয়াহলাদজনকং মাদৃশাস্মণঃ প্রোল্লসতি। হরগৌরী-পদাম্বুজ-মধুব্রতয়ো-রাবয়োঃ কিমলভ্যং তথাপি কালানুসারতো মদনুষ্ঠেয়ে ভবিতব্যে ভবদ্ভির্ব্বি ভাবনীয়ম্। শ্রীযুত-রত্নকন্দলী শ্রীযুত অর্জ্জুন দাস মুখাদবশেষিতং বোদ্ধব্যম্। কিম্বহুনা, বাচাং পল্লবিতেন। বাণাগ্নি-স্কন্দবক্তেন্দু-সম্মিতেশক-

বৎসরে। নবম্যাং চৈত্রিকে কৃষ্ণে লিখিতা পত্রিকা শুভা. লক্ষযোজনতঃ সূর্য্যো ভূমৌ তিষ্ঠতি পঙ্কজম্। দ্বয়োঃ সৌহার্দ্দসম্বন্ধাৎ সময়ে হিতকারিনৌ ১৬৩৫ শকাব্দ, মাস চৈত্র। উপঢৌকনের জায় যথা ঃ— নরা কাপড় একখানা, বুটিদার রঘুনারাণী একখানা, কতিপা একটি, খর্গ দুই জোড়া, জাঁতি দুইটি, পকরা ক্যাটারি চারিখানা।

বড়বড়ুয়া মহেন্দ্র মাণিক্যকে যে পত্র দিলেন তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

স্বস্তি শ্রীমৎ স্বেষ্ঠদেব-চরণ-সবোরুহ-সেবনার্জ্জন-জনিত-নিজ-যশোরাশি-হংসী-বিকাশিতাশামন্ডল, সারাসার-বিচার-চাতুরী-বিরাজমান-রাজপদবী-সমাশ্রিতোদার-চরিত-মহারাজাধিরাজ-শ্রীশ্রীমহেন্দ্র মাণিক্যেষু। অরি-করি-সম্মর্দ্দন-পঞ্চানন-প্রতিম-শ্রীযুত-সুরত সিংহ-বৃহদ্বরুয়া-নামধেয়স্য সপ্রেম বিজ্ঞাপন-পত্রী উদন্তস্থেয়ম। শ্রীমদরিভীমনারায়ণ-বৈবধিক-বদনাম্ভবদ-বিষয়কমখিল-প্রবর্ত্তন-মাকলয্যাহমাপ্যায়িতঃ। পত্রসন্দেশার্থমনা-গর্থঃ প্রস্থাপ্যতে, তদা দাতব্যম্। কিমধিকং বচসাং পল্লবিতেন স এব নিখিলং নিগদিষ্যতি। বাণ-বহ্ন্যর্ত্তু-শুভ্রাংশু-গণিতে শক-হায়ণে। চৈত্রস্য শ্যামপঞ্চম্যাং পত্রমেতৎ প্রহীয়তে। শ্রীরত্নকন্দলী শ্রীযুতার্জ্জুন দাস বার্ত্তাবহাবপি সমস্তমাবেদয়িষ্যত ইতি। উপঢৌকনের জায় যথা ঃ— নরা কাপড় একখানা, শুক্ল চামর একটি। বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূত অরিভীম নারাণকে যে পুরস্কার দিলেন তাহার জায় যথাঃ— সুতী জামা একটি, আঁচলে ফুল তোলা বড়কাপড় একজোড়া, সুতী পটুকা একটি, রঙ্গিন পাগড়ি একটি এবং আতলঞ্চের ইজার একটি।

পরে স্বর্গদেব মহারাজের সঙ্গে সোনারী নদীর পাড়ের অস্থায়ী আবাসস্থানে ত্রিপুরার দূত ও গেলেন। সেখানে স্বর্গ মহারাজ তর্কবাগীশকে জিজ্ঞাসা করিয়া অরিভীমকে দুইশত টাকা এবং সোনার তারেরবালা একজোড়া দিয়া ১৬৩৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসের দুই দিন গত হইলে আমাদের সঙ্গে তাহাকে ত্রিপুরায় পাঠাইয়া দিলেন। আমরা ত্রিপুরায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়া এক বৎসর দুইমাস কাল রাজত্ব করার পর গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছিলেন। মহেন্দ্র মাণিক্যের পর দুর্জয় সিংহ যুবরাজ ত্রিপুরার রাজা হইয়া ধর্ম্ম মাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন। এদিকে ত্রিপুরার ঐ দূতের সঙ্গে আমরা পৌষ মাসের চব্বিশ দিন গত হইলে ত্রিপুরা রাজার নগরে পৌঁছিলাম। ধর্ম্মমাণিক্য রাজা পূর্ব্বের নিয়মে আমাদিগের থাকিবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

—০—

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ধর্ম্ম মাণিক্য আমাদিগকে বিদায় দিলেন

১৬৩৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের দুইদিন গত হইলে ধর্মমাণিক্য রাজা আমাদিগকে দরবারে সংবর্দ্ধনা করিয়া এবং পূর্বের নিয়মে সম্ভাষণ করিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের কুড়িদিন গত হইলে আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য রাজা আর কোনও দূত পাঠাইলেন না। আমাদের হাতে তাঁহার পত্র ও উপঢৌকন দিয়া দিলেন।

ঐ পত্রে লেখা ছিল ঃ—

স্বস্তি শ্রীমদ্ভবানী-পদ-পঙ্কজ-ধূলিপটল-রঞ্জিত-মনোমত্ত-মধুব্রতানবরত-বিস্রাবণ-দূরীকৃত-দুর্গত-দারিদ্র, কর-কলিত-নিস্ত্রিংশধারা-জর্জ্জরীকৃতাশেষ-রিপুকুল, নয়বিনয়-নৈপুণ্য-বশীকৃতাশেষ-দ্বিজ-সজ্জন, কর্পূর-পাণ্ডূর-যশঃপুর-পরিপূরিত-সমস্তাশামণ্ডল, বিবিধগুণ সম্পন্ন-জন-মণ্ডিত-নিজাবাসস্থল, সকল-শাস্ত্র-বিশারদ-বুধমণ্ডলী-পরিমণ্ডিত-গোষ্ঠিকেষু। শ্রীশ্রীযুত-কদ্রসিংহ-মহারাজাধিরাজ-মহামহোগ্র-প্রতাপেষু। প্রবৃত্তি-নিবেদয়িত্রী পত্রীয়মুজ্জৃম্ভতে, শ্রীমতাং প্রেমধানী-ভৃতাণাং ভবিকমিহামহেতরাম। ভবাদদৃশাং পত্রীমবগম্য শ্রীযুত-রত্নকন্দলী শ্রীযুত অর্জ্জুনদাস-মুখাদ্ ভবদীয়-সন্তোষঞ্চ শ্রুত্বা বয়মাপ্যায়িতাঃ। শ্রীদুর্গাচরণ-পঙ্কজ-ভৃঙ্গয়োরাবয়োঃ কিমপি দুর্ল্লভন্নাস্তি। তথাপি সময়বশান্মদনুষ্ঠেয়ে ভবিতব্যে ভবদ্ভির্যদুচিতং বিধেয়ম্। অবশেষ-বৃত্তান্তঃ শ্রীযুত রত্নকন্দলী শ্রীযুতার্জ্জুনদাস দ্বারা বোদ্ধব্যঃ। কিম্বহনাং বচসাং পল্লবিতেন। তৎপ্রেম যৎ পরা-ভেদ্যমনির্ব্বাচ্যমিয়ত্তয়া। অদূরদূরয়োস্তূল্যং বর্দ্ধমানমভঙ্গুরম্। সপ্ত-রামর্ত্তু-শীতাংশু প্রমিতে শক বৎসরে। জৈষ্ঠস্য কৃষ্ণপঞ্চম্যাং লিখিতেয়ঞ্চ পত্রিকা। পত্রসন্দেশার্থং কিমপি প্রেষ্যতে, যথাবিহিতং কার্য্যমিতি। উপঢৌকনের ফিরিস্তি যথা ঃ— বাপ্তা দুই থান, আতলঞ্চ এক থান, ছিট কাপড় দুই থান। এই সকল জিনিসগুলি ধর্ম্ম মাণিক্য স্বর্গদেব মহারাজের জন্য দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল—

স্বস্তি শ্রীমন্নন্দ-নন্দন-পাথোরুহ-রেণু-পিশঙ্গিতান্তঃ-করণ-মধুব্রত, নয়-বিনয়-সদ্বিদ্যালৌল্য বশীকৃতাশেষ-রাষ্ট্রমণ্ডল শ্রীযুত-সুরথসিংহ বৃহদ্বরুয়া নামধেয় মহাশয় পবিত্র চরিত্রেষু। সৌহার্দ্দ

বিজ্ঞাপন পত্রীয়ং বিরাজতে। ভবতাং ভাবুক-বার্ত্তামবগম্য পত্রীং প্রাপ্য চ বয়মাপ্যায়িতাঃ। অস্মদীয় বৃত্তান্তং শ্রীযুত রত্নকন্দলী শ্রীযুতার্জ্জুনদাসৌ নিগদিষ্যতঃ। কিং বহুনা বচসা পল্লবিতেন। অব্ধি-বহ্নি রসক্ষাভি-গুর্ণিতে শক বৎসরে। জৈষ্ঠস্য কৃষ্ণপঞ্চম্যাং লিখিতা পত্রিকা শুভা। পত্রসন্দেশার্থং কিমপি প্রেষ্যতে, তদা দাতব্য মিতি। ধর্ম্ম মাণিক্য বড়বড়ুয়ার জন্য যে উপঢৌকন দিলেন তাহার জায় যথাঃ— অরংজেবী এক থান।

ত্রিপুরার রাজা ঐ পত্র ও উপঢৌকন আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমরা মহারাজের নিকট বলিও যে পূর্ব্বে কখনও তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোনও প্রীতি বা অপ্রীতি কিছুই ছিল না। রত্ন মাণিক্য রাজার সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর হইতে আমাদের মধ্যে উহা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের মধ্যে এই প্রীতি যাহাতে হ্রাস না হয় সেই দিকে তিনি যেন লক্ষ্য রাখেন। দূত আসাযাওয়া করিলে প্রীতি থাকিবে আর না আসাযাওয়া করিলে থাকিবে না এরূপ যেন না হয়। আমরা সর্ব্বদা স্বর্গদেব মহারাজের প্রীতিপথে আছি। তাঁহার বা আমাদের বিশেষ কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে উভয়ে জানাজানি হইয়া সেমতে কার্য্য করা হইবে।" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বের নিয়মে আমাদিগকে টাকা ও কাপড় দিয়া বিদায় দিলেন। আমরা ত্রিপুরা হইতে রওনা হইয়া আসিয়া ভাদ্র মাসে গড়গাঁও এ পৌছিলাম। পরে সেই পত্র ও উপঢৌকনাদি লইয়া স্বর্গদেব মহারাজের চরণে নিবেদন করিলাম।

—০—

'ত্রিপুরা দেশের কথা' পুথির নির্ঘন্ট

	পত্র
আনন্দিরাম মেদি আসিলেন—	৩
আনন্দিরামের সঙ্গে আমাদের লোক গেল—	৪
ত্রিপুরা রাজা আমাদের দেশে দূত পাঠাইলেন—	৮
কাছাড়ের রাজা ত্রিপুরার দূতগণকে সংবর্ধনা করিলেন—	১০
গজপুরে ঐ দূতেরা আসিয়া স্বর্গদেবের লাগ পাইলেন এবং বড়বড়ুয়া তাহাদিগকে সংবর্ধনা করিলেন—	১১
স্বর্গদেব সেই দূতদিগকে সংবর্ধনা ক[illegible] আয়োজন করিলেন—	১৩
পত্র ও উপঢৌকন দিয়া দূতগণকে বিদায় দিলেন—	১৯
ঐ দূতদিগকে দুর্গোৎসবের সময়ে মন্দিরে প্রণাম করাইল—	২৭
আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরার দূতদিগকে উদয়পুরে পাঠাইয়া দিলেন—	৩০
ত্রিপুরায় যাওয়ার পথের এবং সেখানে যাহা আছে তাহার বিবরণ—	৩১
ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় পৌঁছিলাম—	৩৫
ত্রিপুরা রাজার রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ—	৩৬
ত্রিপুরা রাজার মাণিক্য নাম কি প্রকারে হইল—	৫১
ত্রিপুরা রাজার পূর্ব্বপুরুষদের কথা—	৫৩
চম্পক রাই এর সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহাকে বধ করিল—	৫৭
রাজার দৈনিক আচরণ—	৬১
কবিশেখরের ভগ্নীকে রাজা পত্নী করিয়া আনিলেন—	৬৩
রাজার ভগ্নীকে রাজদুর্লভ নারাণের নিকটে বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে আরোয়ান ও নিশান দিলেন—	৬৫
মুরাদ্‌বেগের ভগ্নীকে আনিবার জন্য রাজা গোপনে একজন সেবক পাঠাইলেন, তাহাকে কাটিয়া ফেলিল—	৬৬
ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজা হইবার জন্য মুরাদ্‌বেগের সঙ্গে রাজার বিরোধ সৃষ্টি করিলেন এবং এই সংবাদ রাজা জানিতে পারিলেন না—	৬৭
ঘনশ্যাম ঠাকুর হাতী ধরিতে গেল—	৭১
আমাদিগকে দরবারে সংবর্ধনা করিবার আয়োজন করিল—	৭৪
আমাদিগকে আমাদের দেশের পুরাতন কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং আমরা বলিলাম—	৮৬
মোট খেলা—	৮৯

পত্র

ঘনশ্যাম রাজা হইবার জন্য মুরদ্‌বেগের নিকট লোক পাঠাইয়া বংলা দেশ হইতে লোক নিযুক্ত করিয়া আনাইতে লাগিল— ৯৯
মামুদ্‌ছফি ও ঘনশ্যাম শপথ গ্রহণ করিল— ১০১
যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব রাজাকে বলিলেন, "ঘনশ্যাম বিদেশী লোক নিযুক্ত করিয়া নিজে রাজা হইতে চায়"— ১০২
ঘনশ্যাম, মামুদ ছফি এবং মুরাদ্‌বেগ মন্ত্রণা করিতে লাগিল— ১০৩
ঘনশ্যাম যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবকে তাহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইল— ১০৪
যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামের নিকট গেল — ১০৮
কোতোয়াল মছিবকে ঘনশ্যাম শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল— ১০৯
যুবরাজ দশ হাজার টাকা মামুদ ছফিকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়িতে আসিয়া গোপনে রাজাকে জানাইল— ১১১
ঘনশ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া আসিল— ১১৪
পীতাম্বর হাজারী রত্নমাণিক্য রাজার হাতে ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিল— ১১৫
ঘনশ্যাম রাজা হইল— ১১৬
কোতোয়াল মুছিবকে কাটিল এবং ঘনশ্যামের নামে মোহর গড়াইল— ১১৮
আমাদিগকে সংবর্ধনা করিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেইদিন হঠাৎ রাজার ঘরে আগুন লাগিল— ১২০
গঙ্গানারাণী ধাই রত্ন মাণিক্যকে বধ করিবার জন্য পরামর্শ দিল— ১২৩
রত্ন মাণিক্যকে বধ করিবার জন্য মামুদ ছফির মতামত জিজ্ঞাসা করিল— ১২৫
রত্নমাণিক্যকে বধ করা হইল, ইহাতে দেশের লোকেরা কাঁদিল— ১৩০
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জিনিসাদি দিয়া মামুদছফিকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিল— ১৩৩
রত্নমাণিক্যের শ্রাদ্ধ করাইল; পত্র ও উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া অরিভীমকে দূতরূপে আমাদিগের সঙ্গে দিয়া বিদায় দিল— ১৩৪
ত্রিপুরার দূতকে সঙ্গে লইয়া আমরা রংপুরে পৌঁছিলাম— ১৩৫
ত্রিপুরার দূতকে বড়বড়ুয়া সংবর্ধনা করিলেন— ১৩৫
স্বর্গদেব ত্রিপুরার দূতকে সংবর্ধনা করিলেন— ১৩৬
স্বর্গদেব ত্রিপুরার দূতকে বিদায় দিলেন— ১৩৯
বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতকে বিদায় দিলেন— ১৪০
অরিভীমের সঙ্গে আমরা যখন ত্রিপুরার রাজধানীতে পৌঁছিলাম তখন মহেন্দ্র মাণিক্য মারা গিয়াছে এবং ধর্ম্মমাণিক্য রাজা হইয়াছে— ১৪৩
ত্রিপুরার রাজা আমাদিগকে সংবর্ধনা বিদায় দিলেন— ১৪৪
আমরা গড়গাঁও এ পৌঁছিলাম— ১৪৬

[illegible]